মেলায় মেলায় আমার দেশ

ভবেশ দত্ত

ভোলানাথ প্রকাশনী
৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন • কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীসুরেশ দাস
৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা—৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ :
৮ই নভেম্বর—১৯৫৮

প্রচ্ছদ শিল্পী :
রাজেন চক্রবর্তী

মুদ্রাকর :
ডি কে জি প্রিন্টার্স
৬১/এ গোয়াবাগান স্ট্রিট
কলিকাতা—৭০০০০৬

সূচীপত্র

উৎসর্গ

বিকাশ মুখোপাধ্যায়

ও

কবিতা মুখোপাধ্যায়কে—

বাবা

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :—

তারাপীঠের পাঠক
প্রভু নিত্যানন্দ
সাধক তুলসীদাস
সাধক হরিদাস
সাধক রুইদাস
পরমহংস স্বামী নিগমানন্দ
প্রেমময় রামঠাকুর
সাধক কমলাকান্ত
ভারতের সাধিকা
ভারতের পরমাসাধিকা
শ্রীশ্রীসত্য সাইবাবা
সাধক বিজয়কৃষ্ণ
সাধক কবীর
সাধক সর্ব্বানন্দ
সাধক ও মহাপুরুষের—
অলৌকিক কাহিনী

আমার কথা

ভারতবর্ষ দেব দেউলের দেশ।

ভারতবর্ষ পালপার্বন উৎসবের দেশ। যুগে যুগে কালে কালে নানান দেব-দেবীর পদচিহ্ন ধারণ করে আছে এই দেশের মৃত্তিকা পথে ঘাটে, অন্দরে বন্দরে নীলবনানীর কোলে তুষার মৌলি পর্বতের তলদেশে আজও দাঁড়িয়ে আছে কত শত হাজার মন্দির মশজিদ ও গির্জা, আর এইসব ঘিরে বসছে মেলা, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলছে উৎসব আনন্দ। পশ্চিম বাংলাতেও মেলায় মেলায় মন্দির-মশজিদ-গির্জায় পুন্যতোয়া কত নদীর তীরে বসছে মেলা। মানুষে মানুষে মিলন ক্ষেত্রই তো মহামিলনের মেলা। এইসব মেলা নিয়েই সৃষ্টি হয়েছে 'মেলায় মেলায় আমার দেশ'। ইচ্ছে ছিল পশ্চিম বাংলার সমস্ত মেলাকেই লিপিবদ্ধ করব কিন্তু নানান কারণে তা সম্ভব হয়নি বলে আমি নিজেও খুব অনুতপ্ত। এই মেলা ঘুরে ঘুরে যখন লিখতে সুরু করি তখন প্রতিমাসে প্রকাশিত হতে থাকে কখনও 'মানসীতে' কখনও 'যুগান্তরে' কখনও 'সত্যযুগে', ঠিক এমনি সময় 'নবান্ন ভারতী' পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রী জ্যোতির্ময় ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ায় তিনি প্রতি মাসে তাঁর কাগজে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে প্রকাশ করেন এই সব মেলা। সেই সব মেলাগুলি একত্র করে প্রকাশিত হল 'মেলায় মেলায় আমার দেশ' শ্রদ্ধেয় শ্রী জ্যোতির্ময় ঘোষকে জানাই আমার অভিনন্দন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ এই বই প্রকাশে আংশিক অর্থ সহায়তা করার জন্য অবশ্যই ধন্যবার্দাহ। ভবিষ্যতে বিভিন্ন জেলার মেলা নিয়ে যাতে এমনি ধারা বই আরও প্রকাশ করতে পারি সেই চেষ্টা অবশ্যই আমার থাকবে।

অনুজপ্রতিম প্রীতিধন্য শ্রীসুরেশ দাশ অত্যন্ত যত্ন সহকারে এই বই প্রকাশ করে একটা মহৎ কাজ করছেন বলে আমি মনে করি এ জন্য তাঁকেও আমার ধন্যবাদ জানাই।

পত্র পত্রিকায় এই লেখাগুলি প্রকাশ কালে কিছু কিছু সংস্কৃতিবান পাঠক পাঠিকা আমাকে উৎসাহিত করেছেন সে জন্য তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

ভবেশ দত্ত

মেলায় মেলায় আমার দেশ

মেলায় মেলায় আমার দেশ। বারো মাসে তেরো পার্বণের দেশ এই পশ্চিমবাংলা। অভাবে অনটনে দারিদ্র্যের জ্বালায় সাধারণ মানুষের আজ কি দুর্গতি। ঘরে সব জিনিষ বাড়ন্ত, তবুও এর ভেতর দিয়ে চলছে দেব দেবতার পূজা। নানান ধর্মীয় অনুষ্ঠান। মানুষ নিজে উপবাসে থেকেও দেব-দেবতাকে উপবাসে রাখে না। দেব-দেবতার দেশ ভারতবর্ষ। মানুষ হাজার দুঃখেও ভোলেনি তাঁদের কথা। নিজের ঘর অন্ধকার, অথচ ঠাকুরঘরে নিত্য ধূপ-ধূনোর আরতি চলছে। এই আমাদের বাঙালীর বৈশিষ্ট্য। এই দেব-দেবতাকে ঘিরে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বসছে মেলা। হোচ্ছে মহোৎসব।

ধর্ম আর কর্ম। কর্ম আর ধর্ম।

এই দুই-ই তো মানুষের জপমালা। এই মালাজপেই মানুষের দিন কাটছে। ধর্ম ছাড়া কর্ম নেই, কর্ম ছাড়া ধর্ম নেই। এই আমাদের মন্ত্র। এই আমাদের তন্ত্র। দেব-দেবতার কৃপা কে পাচ্ছে আর কে না পাচ্ছে তার হিসাব দিতে পারবো না, তবে এইটুকু জানি যে দেবদেবতা ছাড়া মানুষ নেই। এই মানুষের মাঝেই চলছে তাঁর নিত্যপূজা ও উৎসব। মানুষই তো ভগবান যুগে যুগে। শ্রীরামচন্দ্র মানুষ ছিলেন, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য মানুষের ঘরে জন্মগ্রহণ করে মানুষের মতই আচরণ করেছেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণও একই ভাবে মানুষের সাথে মানুষের মতই ব্যবহার করেছেন। আজকের এই ঘা-খাওয়া মানুষের মাঝে মানুষের বেশেই ভগবান আছেন। একদিন না একদিন তিনি অবশ্যই প্রকাশ হবেন। আমাদের মনের মালিন্য একদিন মুছে যাবে। হৃদয়ের পাশববৃত্তি একদিন শেষ হয়ে যাবে। প্রাণে প্রাণে একদিন আমরা এক হয়ে যাবো, সেদিন ভগবান নিশ্চয়ই ধরায় নেমে আসবেন। ঘরে ঘরে আজ অদ্বৈত মহাপ্রভুর মত ডাক চলেছে, 'তুমি এসো। মানুষের ভিতর আজ প্রেমের অভাব। পশুবৃত্তি তাদের আজ নিঃস্ব করে ফেলেছে দিনের পর দিন, তুমি তাদের বাঁচাও।'

তাই চলেছে দেশে দেশে পূজো উৎসব মেলা। মানুষে মানুষে সব আজ একাকার। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন প্রান্তে আজও প্রতি মাসে বসছে মেলা। সংক্ষেপে তারই একটা মাসোয়ারী ছক দিলাম পাঠক-পাঠিকাদের। আমি জানি সবার পক্ষে সব যায়গায় যাওয়া সম্ভবপর নয়। বিভিন্ন জেলায় আরও মেলা আছে যা এই অল্প জায়গায় দেওয়া সম্ভব হোল না।

মোটামুটি একটা মেলার ছক দিলাম। যদি কারও পক্ষে সম্ভব হয় যে মাসে হোক যেখানে ইচ্ছা ঘুরে আসতে পারেন। মেলায় মেলায় মানুষের মিলন ক্ষেত্র —আপনিও মিলে যান সেই মিলন মেলায়।

বৈশাখ মাস :—

১লা বৈশাখ—হুগলী জেলার কোন্নগরে বাসি চড়কপূজা ও মহামেলা।

২২শে—প্রবর্তক সঙ্ঘে অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব ও মেলা।

২২শে—শ্রীধাম নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর চন্দনযাত্রা উৎসব।

২৪শে—মুর্শিদাবাদ জেলার বিকলনগরে শ্মশান কালীমাতার পূজা ও মেলা।

২৫শে—শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রমেলা।

২৮শে—মুর্শিদাবাদ জেলার ডাহাপাড়া গ্রামে প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের জন্মোৎসব ও মেলা।

৩১শে—মুর্শিদাবাদ জেলায় রঘুনাথগঞ্জে তুলসী বিহার উৎসব ও মেলা।

৩১শে—বর্দ্ধমান জেলার কৈচর ষ্টেশন থেকে মাইল দুই দূরে ক্ষীরগ্রামে দেবী যুগাদ্যার পূজা ও মেলা।

জ্যৈষ্ঠ মাস :—

সারা জ্যৈষ্ঠমাস ধরে নদীয়া জেলার আড়ংঘাটায় যুগলকিশোরের মেলা।

২রা—নদীয়ার বীরনগরে উলাইচণ্ডীর পূজা ও মেলা। উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ায় বিন্ধ্যবাসিনী ও মহিষমর্দিনী পূজা।

২রা—বর্দ্ধমান জেলার শক্তিগড় ষ্টেশন থেকে ৫ মাইল দূরে বোড়া গ্রামে শ্রীশ্রীবলরাম জীউর চক্ষুর্দ্দান ও গাজন মেলা।

১৭ই—মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া রেলস্টেশনের ৪ মাইল দূরে বেগুনবাড়ী গ্রামে কালীপূজার বলি ও মেলা।

১৯শে—শালকিয়া বাঁধাঘাটে ত্রিকালদর্শী সাধক শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীর জন্মোৎসব ও মেলা।

২৫শে—মেদিনীপুর জেলার দাশপুর থানার বলিহারপুর গ্রামে শ্রীশ্রীরক্ষা-কালীর পূজা ও মেলা।

২৭শে—নদীয়া জেলার পায়রাডাঙ্গা ষ্টেশন থেকে দেড়মাইল দূরে গৌরনগরে চূর্ণী ও গংগার সংগমস্থলে দশহরা উপলক্ষে বিরাট মেলা ও গংগাপূজা।

৩২শে—নদীয়া জেলার চাকদহ ষ্টেশনের কাছে যশড়া গ্রামে গৌড়ীয় মঠে মহাপ্রভুর স্নানযাত্রা উৎসব ও মেলা।

আষাঢ় মাস ঃ—

৫ই—আষাঢ় বাঁকুড়া জেলার বারপেটা গ্রামে মা মনসার পূজা ও মেলা।

৯ই—হুগলী জেলার শেওড়াফুলী গ্রামে শ্রীশ্রীনিস্তারিণী মাতার মহাপূজা ও মেলা।

১৭ই আষাঢ়—হুগলী জেলার মাহেশে রথের মেলা। মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলে রাজা গর্গবাহাদুরের বিরাট রথের মেলা। নৈহাটি কাঁঠাল পাড়ায় রথের মেলা। ২৪ পরগণা জেলার উকিলবাবুর হাটে রথযাত্রা উপলক্ষে সপ্তাহ ব্যাপী মেলা।

২৪শে আষাঢ়—বর্দ্ধমান জেলার হাটগোবিন্দপুর গ্রামে শ্রীশ্রী৺পঞ্চানন দেবের পূজা উপলক্ষে মেলা।

শ্রাবণ মাস ঃ—

৭ই শ্রাবণ—বীরভূমের ৺তারাপীঠে সাধক শ্রীশ্রীবামাক্ষেপার তিরোভাব মহোৎসব ও তদুপলক্ষে ৺তারা মার পূজো ও মেলা।

২৪শে শ্রাবণ—শ্রীধাম নবদ্বীপে গোবিন্দ জীউর মন্দিরে ঝুলনযাত্রা মেলা।

২৪শে শ্রাবণ—নদীয়ার রাণাঘাটে রাধাবল্লভ জীউর মন্দিরে পূজা ও মেলা। ইচ্ছাপুর নবাবগঞ্জে ঝুলনের বিরাট মেলা।

৩২শে শ্রাবণ—চাকদহ ষ্টেশন থেকে মাইল পাচেক দূরে বাসে রেলে বিষ্ণুপুর তথা হইতে শলাকী গ্রামে খেদাইতলায় মা মনসার পূজা ও মেলা। বর্দ্ধমান জেলার খানা জংশন থেকে দু'মাইল দূরে চান্নাগ্রামে কালীসাধক কমলাকান্তর সাধনপীঠ বিশালাক্ষী মাতার মন্দিরে পূজা ও বিরাট মেলা।

ভাদ্র মাস ঃ

৪ঠা ভাদ্র—মেদিনীপুর জেলায় ক্ষেপুত বরুণা গ্রামে জন্মাষ্টমীর মেলা।

আশ্বিন মাস ঃ—

৫ই আশ্বিন—শ্রীপাট খেতুর ও বালুচর গাম্ভিলা পাটে ঠাকুর নরোত্তমের তিরোভাব উৎসব উপলক্ষে ধুলোট ও মেলা। মেদিনীপুর জেলায় পাথরকাটি গ্রামে জয় চণ্ডির পূজা ও মেলা।

কার্তিক মাস ঃ—

৮ই—ত্রিপুরা রাজ্যে উদয়পুরে শ্রীশ্রী৺ ত্রিপুরেশ্বরী মাতার পূজা ও মেলা। দক্ষিণেশ্বর গুরুধামে শ্রীশ্রী৺ বিশ্বমাতার পূজা। হুগলী জেলার রিষড়ায় সিদ্ধেশ্বরী মাতার পূজা উপলক্ষে মেলা। হালিসহরে রামপ্রসাদের ভিটায় কালীপূজা ও অন্নমহোৎসব।

১৭ই কার্তিক—বোলপুর ষ্টেশনের কাছে মুলুক গ্রামে রাধাবল্লভ জীউর পাঁচদিন ব্যাপী মহোৎসব মেলা।

১৮ই কার্তিক—বৈদ্যনাথ ধামে রামময় আশ্রমে কুণ্ডেশ্বরী মাতার পূজা।

২০শে কার্তিক—মেদিনীপুর জেলার ময়না থানায় গড়ময়না গ্রামে শ্যামসুন্দর জীউর রাসমেলা।

২৩শে কার্তিক—বাঁকুড়া জেলার কোতলপুর গ্রামে শ্রীশ্রী৺কৃষ্ণরায় জীউর রাস ও মেলা। নদীয়া জেলার মাজদীয়া ষ্টেশন থেকে মাইল তিনেক দূরে ভাজনঘাটে রাধাবল্লভের রাসমেলা। গড়বেতার কালাচাঁদ জীউর রাসমেলা। বীরভূমের পাহাড়পুর নিত্যধামে রাসোৎসব। বাঁকুড়ার খামারবেড়ে গ্রামে, মেদিনীপুর জেলার শাউটিয়ায়, বেলঘরিয়া উত্তর নিমতা চৌধুরী পাড়ায়, রাইকিশোরী বংকুবিহারীর রাসযাত্রা উৎসব উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রদর্শনী ও মেলা। শান্তিপুর ও নবদ্বীপের রাস। চাকদহে ষ্টেশনের কাছে বিরাট পুতুল প্রদর্শনীর মাধ্যমে রাসলীলা।

অগ্রহায়ন মাস :—

৮ই অগ্রহায়ণ—হাওড়া জেলায় খড়িয়া গ্রামে শ্মশানকালীর পূজা উপলক্ষে একমাসব্যাপী মেলা।

১৬ই অগ্রহায়ণ—হাওড়ার নিকটে নপাড়া গ্রামে চণ্ডীমণ্ডপে শমী চণ্ডীপূজা ও মেলা।

১৭ই অগ্রহায়ণ—চন্দননগরে বিখ্যাত খৃষ্টীয় মেলা।

পৌষ মাস :—

৪ঠা—কাঁচরাপাড়া ও কল্যাণীর মাঝামাঝি কুলিয়া গ্রামে অপরাধ ভঞ্জনের মহোৎসব ও মেলা।

৯ই পৌষ—রাণাঘাটের নিকট বেগোপাড়ায় বড়দিন উপলক্ষে ভগবান যীশুখ্রীষ্টের প্রার্থনা, বৈদ্যুতিক প্রদর্শনী ও বিরাট মেলা।

১৬ ই—দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে কল্পতরু উৎসব ও মেলা।

২৩শে—২৪ পরগণা জেলার খড়দহ হরিবাড়ীতে পাঠ ও কীর্তন মেলা।

২৯শে—পৌষ সংক্রান্তিতে গংগাসাগরে কপিলমুনির মন্দিরে পূজা ও মকর-সংক্রান্তির স্নান। বীরভূমের কেন্দুবিল্বে ভক্তকবি জয়দেবের জন্মস্থানে বিরাট মেলা ও অজয়নদীতে সংক্রান্তির স্নান। মেদিনীপুরের ঘাটাল সদরঘাটে মকর স্নান ও গংগাপূজা।

মাঘ মাস ঃ—

১লা মাঘ—হুগলি জেলার পাণ্ডুয়ায় সাহ্‌ফকির দরগার নিচে বসে একমাস ব্যাপি মাঘ মেলা, এতে আদিবাসি ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে হিন্দুরাও যোগদান করেন।

২০শে—মাজদিয়া ষ্টেশন থেকে দু-মাইল দূরে শিব নিবাসে ভৈমী একাদশীর বিরাট মেলা।

২২শে মাঘ—বীরভূম জেলার তারাপীঠ থেকে পাঁচ মাইল দূরে বীরচন্দ্রপুরে নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব উৎসব ও মেলা।

২৩শে—হুগলী জেলার কোন্নগরে শ্রীশ্রী৺রাজরাজেশ্বরী মাতার পূজা ও মেলা।

২৮শে—শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীমদভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর আবির্ভাব উৎসব ও হাজার পুতুলের মাধ্যমে রামায়ণ ও মহাভারত প্রদর্শনী।

মাঘী পূর্ণিমা—ফুলিয়ার বাংলার আদিকবি কৃত্তিবাসের জন্মোৎসব। প্রদর্শনী ও রামায়ণ মেলা। চাকদহের গণেশ জননীর পূজা ও মেলা।

ফাল্গুন মাস ঃ—

৮ই—শিবরাত্রি উপলক্ষে ৺তারকেশ্বর ধামে পূজা ও মহামেলা। শ্রীরামপুরের নিকট ঠাকুর বাড়ীতে ও হুগলীর খানাকুল গ্রামে শ্রীশ্রী৺ঘণ্টেশ্বরজীউর শিবরাত্রি মেলা। মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রী গ্রামে শ্রীশ্রীচন্দ্রশেখর জীউর পূজা ও মেলা।

১৯শে—বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব।

২৪শে—হুগলীর পাণ্ডুয়াতে শ্যামসুন্দরের মন্দিরে দোল মেলা।

কল্যাণীর কাছে ঘোষপাড়ায় সতীমায়ের দোল ও বিরাট মেলা।

চৈত্র মাস ঃ—

২রা চৈত্র—হাওড়ার শিবপুরে শীতলা মাতার পূজা ও মেলা।

৭ই চৈত্র—২৪ পরগণার ঠাকুরনগর ষ্টেশনের কাছে শ্রীশ্রী৺হরি ঠাকুরের জন্মোৎসব ও মেলা।

১০ই চৈত্র—২৪ পরগণার মথুরাপুর রোড ষ্টেশনের কাছে মাঠবহর গ্রামে শিবমেলা।

১৬ই চৈত্র—বীরভূমের নান্নুর গ্রামে চণ্ডীদাসের বাশুলী দেবীর মন্দিরে চারদিন ব্যাপী পূজা ও মেলা।

১৮ই—হাওড়ার রামরাজাতলায় শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের পূজা ও মেলা শুরু—শ্রাবণের শেষ রবিবার বিসর্জন।

২০শে—নদীয়ার কৃষ্ণনগরে রাজভবনে দ্বাদশ দোল ও বিরাট মেলা।

৩১শে চৈত্র—২৪ পরগণা জেলায় চাঁদপাড়ার কাছে জলেশ্বর গ্রামে চড়ক-পূজার মেলা।

অপরাধ ভঞ্জনের পাট

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের প্রেমধর্মের নামবন্যায় ন'দে ডুবুডুবু। আকাশে-বাতাসে শুধু নাম গান।

গঙ্গার কুলুকুলু ধ্বনিতেও বুঝি একই সুর।

পাখীর কলকাকলীতে, প্রভাতের শিশিরভেজা সবুজ বনানীতেও সেই একই গানের সুর। এমন গান, এমন নাম, নদীয়ায় আর কেউ কখনো শোনেনি। নামের এমনই মহিমা যে সবাই যেন এক নতুন পথের সন্ধান পেয়েছে। সে পথ ফুল ছড়ানো পথ, সে পথ চির আনন্দের পথ। সে পথ মানুষের অনাদি-কালের আকাঙ্খিত পথ। চিরস্থায়ী ও অনির্বচনীয় শান্তির দিগ্‌দর্শনের মন্ত্র পেয়েছে সবাই।

ডুবে যায় নদীয়া। নদীয়া ডুবে যায়।

এমন করুণার ঠাকুর আর হয় না। কলির পাপী-তাপী জীবকে উদ্ধার করার জন্যই যেন তাঁর এ মাটিতে অবতরণ হয়েছে।

পথ পেয়েছে কলির মানুষ। শ্রী ভগবানের করুণা লাভের পথ—

"জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব যৌবন
ইহা বই ধর্ম নাই শুন সনাতন"
(চৈঃ চঃ)

কিন্তু আলোর পাশেই অন্ধকার। চন্দ্রের শীতল শোভার পরেই প্রখর সূর্যের দাবদাহ।

বিরোধী হলেন নদীয়ার স্মার্ত সম্প্রদায় ব্রাহ্মনেরা। ধর্ম বুঝি রসাতলে যায়। বিধর্মীর স্পর্শে নদীয়ার মাটি হয় বুঝি বেদনার্ত। ভাবলেন যত সমাজপতির দল। এ হতে দেওয়া যায় না।

বৈষ্ণব ধর্মের জোয়ারে ব্রাহ্মণের সবকিছু বুঝি লোপ হয়ে যায়। শায়েস্তা করতে হবে এইসব ভণ্ড বাবাজী-বোষ্টমদের। বুঝিয়ে দিতে হবে যে নদের মাটিতে এসব বুজরুকি চলবে না।

জগাই মাধাই তখন নদীয়ার কোটাল। সুরা পান করে তাদের শরীরে মনে আশ্রয় নিয়েছে আসুরিক বৃত্তি। আনন্দে উল্লসিত হলেন স্মার্ত সম্প্রদায়।

উল্লসিত হল তাদের ক্লেদাক্ত মন। বানের জলে যেমন ভেসে যায় একূল ওকূল। উদ্বেল তরঙ্গ স্রোতে যেমন ধ্বসে যায় তীরের মাটি, তেমনি শ্রী মহাপ্রভুর নামের দুর্বার তরঙ্গে ভেসে গেল জগাই মাধাইয়ের আসুরিক বৃত্তি।

হৃদয় যমুনার অশান্ত তীরগুলো গেল ভেঙ্গে। চিরদিনের মত ধ্বংস হল তাদের মনের আসুরিক প্রাসাদ। নদীয়ার কোটাল জগাই-মাধাই বন্দী হল মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের কারাগারে।

সুরায় যাদের দিন কেটেছে, সুধা পেয়ে তারা হৃদয় ভরালো।

কিন্তু ওদিকে শান্ত হল না পাষণ্ডের দল। নতুন পথ খুঁজতে লাগল তারা। উচ্ছেদ করতে হবে বৈষ্ণব ধর্ম।

নায়ক কোথায় ?

এগিয়ে এল গোপাল। এ বিরোধে অধিনায়কত্বের ভার নিল সে একাই।

প্রথম কৌশল সে বার করল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের নাম প্রকটের কেন্দ্রস্থল শ্রীবাস অঙ্গন। গোপাল শ্রীবাস আঙ্গিনার দোরে ভবানী পূজার আয়োজন করল। ভাবল, এইবার কিস্তি মাৎ। তার অধিনায়কত্বের পূর্ণতা বুঝি এইবার হল। ত্রিভুবন বিজয়ীর মত গোপাল নিজের কপালে বড় করে সিন্দুরের টিপ পরল। অহঙ্কারের বিজয় তিলক।

"একদিন এক বিপ্র চপল গোপাল।
পাষণ্ডী প্রধান সেই দুর্মুখ বাচাল॥
ভবানী পূজার সেই সামগ্রী আনিয়া।
রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপাইয়া॥
কলার পাত উপর থুইল ওর ফুল।
হরিদ্রা, সিন্দুর, রক্তচন্দন তণ্ডুল॥
মদ্যভাণ্ড পাশে ধরি নিজ ঘরে গেলা।
প্রভাতে উঠিয়া শ্রীবাস দেখিতে পাইলা॥

(চৈঃ চঃ)

দেশবাসীকে দেখাতে হবে, যে বৈষ্ণব ধর্মের সবটাই ভণ্ডামি। তারা প্রতি-রাত্রে মদ ভাঙ খায় মজা করে আর দিনের বেলা বৈষ্ণব সাজে। এ প্রতারণা ছাড়া আর কি হতে পারে ?

বৈষ্ণবরা প্রতারক।

এ অপবাদ কি সহ্য হয় ? বৈষ্ণব ধর্মের যিনি ধারকবাহক সেই ভগবান

মহাপ্রভু চৈতন্য—তিনি প্রতারক। না, না, এ হতে পারে না। চোখের জলে নদী বয়ে যায় বৈষ্ণবদের। তারপর—

'তিনদিন পরেই চপল গোপাল।
সর্ব্বাঙ্গে হৈল কুষ্ঠ বহে রক্তধার ॥
সর্ব্বাঙ্গে বেড়িয়া কীট কাটে নিরন্তর।
অসহ্য বেদনা দুঃখে জলয়ে অন্তর ॥ (চৈঃ চঃ)

ঘরে স্থান হয় না চপল গোপালের। স্ত্রী দেবী নিস্তারিনী চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী করে যার সাথে ঘরে একদিন এসেছিলেন কোন সাক্ষী না রেখেই আজ তিনি তাকে বার করে দিলেন গঙ্গার ধারে।

অন্তর্যামী নীরবে শুধু হাসলেন মাত্র। বললেন—

শ্রীবাসেরে করাইলি ভবানী পূজন।
কোটি জন্ম ঐছে তোর রৌরবে পতন ॥
পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার।
পাষণ্ডী সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার ॥ (চৈঃ চঃ)

কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত চপল গোপাল যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে গঙ্গায় ঝাঁপ দিলে। কিন্তু গঙ্গায় মরণ তার হল না। গঙ্গা তাকে কোল দিল না, দূরে সরে গেল।......কতবড় মহাপাপী এই চপল গোপাল যাকে দেখে গঙ্গাও মুখ ফিরিয়ে নিল। প্রতি জলবিন্দুতে যার প্রেমময় মহাপ্রভুর নাম, যে নাম হৃদয়ে ধারণ করে গঙ্গা পতিত পাবনী তার বুকে আশ্রয় নেবে এক শয়তান পাশব মূর্তি?

মৃত্যু হল না চপল গোপালের। যন্ত্রণায় সে ছটফট করে। উপায় কি? হাঁ, উপায় একটা আছে। সে ৺কাশীধামে বাবা বিশ্বনাথের দুয়ারে গিয়ে ধর্ণা দিল। বাবা বিশ্বনাথ কি তাকে মুক্তি দেবেন? কিন্তু এ যন্ত্রণা থেকে রেহাই মেলে না। স্বপ্নাদেশ হল যে নদীয়া বিহারী মহাপ্রভুর কৃপা ছাড়া তার কোন মুক্তি নেই।

দুস্তর পথ। গিরি কন্দর বুকে হেঁটে কোন রকমে সে ফিরে এল আবার নদীয়ায়।

মহাপ্রভু তখন নীলাচলে চলেছেন—। হতাশায় ভেঙে পড়ে চপল গোপাল।

দিন যায়, মাস যায়, দেখা তো মেলে না। আর কি তবে দেখা হবে না? বৈষ্ণবের বিরুদ্ধাচারণ করে যে অপরাধ সে করেছে মহাপ্রভু কি তা ক্ষমা করবেন

না ? চপল গোপালের চোখে অবিরাম জলের ধারা।

সন্ন্যাস করিয়া যবে নীলাচলে গেলা।
তথা হৈতে প্রভু যবে কুলিয়া গ্রামে আইলা॥
(চৈঃ চঃ)

পতিত পাবনের কৃপা তার চাই-ই। নইলে এ মহাযন্ত্রণার হাত থেকে তার মুক্তি নেই। চোখে ঘুম নেই তার। আহার নেই। অবশেষে সে শ্রী শ্রী নামের আশ্রয় নিল।

"যেই নাম সেই নামী ভিন্ন নাহি হয়
নামীরে পাইতে নাম করহ আশ্রয়॥
নামের করুণা যবে হইতে তোমাতে
অবশ্য হইতে প্রাপ্তি আন নাহি চিতে॥
(মঃ পঃ)

স্বপার্ষদে প্রভু নীলাচলনাথের গুণকীর্তন করছেন শ্রী পাট কুলিয়ায়। মস্তক মুণ্ডিত। সারা মুখ মণ্ডল অপূর্ব জ্যোতিতে ভাস্বর। মনে হচ্ছে যেন পূর্ণিমা আকাশের চাঁদ নেমে এসেছে ধরণীর ধূলিতে। দু' চোখে জলের ধারা নেমে চলেছে অবিরাম। মনে হচ্ছে যেন অমৃত ধারা মুক্তাবিন্দুর মত ঝরে ঝরে পড়ছে সমস্ত অঙ্গে। প্রভুর শ্রীমুখের বাণী সবাই আকুল হয়ে শুনছে। ধন্য কুলিয়ার বনপ্রান্তর, ধন্য কুলিয়ার ধূলিকণা। পাশে যমুনার জলও বুঝি প্রভুর কথা কান পেতে শুনছে।. জোয়ার ভাঁটাও বুঝি স্তব্ধ। আকুল হয়ে উঠেছে যমুনার মন প্রাণ।

এমন সময় চপল গোপাল এসে প্রভুর চরণে লুটিয়ে পড়ল। তার চোখের জলে ধুয়ে যায় প্রভুর শ্রীচরণ দু'টি। প্রভু চপল গোপালের অপরাধ ভঞ্জন করলেন।

গৌর গৌর বলে চপল গোপাল যমুনায় আছড়ে পড়ে। এক নিমেষে মিলিয়ে যায় গলিত কুষ্ঠ। সমস্ত ক্লান্তি, সমস্ত যন্ত্রণার উপশম হয়ে যায় চোখের পলকে। অপূর্ব সুঠাম দেহ ফিরে পেয়ে সে আনন্দে নাচতে থাকে।

এ কাহিনী আজ ৪৫০ বছর আগেকার। সেই সময় এক অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণ একাদশী তিথিতে শ্রীপাট কুলিয়াতে এই অপরাধভঞ্জন লীলা হয়েছিল।

কুলিয়ার পাট আজ হিন্দুদের কাছে এক পবিত্র তীর্থস্থান। আজও প্রতি-বছর অগ্রহায়ণের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে তিনদিন ধরে নাম কীর্তন হয়। বিরাট

মেলা বসে। দূর দূরান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ আসে। কুলিয়ার পাটে গৌর নিতাইয়ের মন্দির ও দ্বাদশ বকুলের কুঞ্জ আছে।

মন্দিরের পাশে যমুনা নদী আজও আছে। তবে সে নদী আজ মথুরার বিল নামে খ্যাত। জনশ্রুতি আছে যে মথুরার বিলই একদা যমুনা হয়ে বয়ে যেত। সে নীল যমুনা আজ পথ ভুলে গেছে। আজ সে শুধু মথুরার বিল।

ইষ্টার্ণ রেলের কাঁচড়া পাড়া ষ্টেশন থেকে পীচের রাস্তা ধরে তিনমাইল পথ গেলেই কুলিয়ার পাট। কল্যাণী ষ্টেশন থেকেও মাইল দেড়েক গেলে কুলিয়ার পাটে পৌছানো যায়। কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশনের পূর্ব ধার দিয়েই সোজা চলে গেছে। মথুরার বিল কুলিয়ার পাটের দিকে। পথের একপাশে গড়ে উঠেছে বিরাট এক ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ আর একপাশে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের ফিশারী রিসার্চ ষ্টেশন।

যমুনা আজ নেই। কিন্তু আছে মথুরার বিল। তার বুকে আশ্রয় নিয়ে ধন্য হয়েছে কচুরি পানা।

নীলাচলে গেছেন মহাপ্রভু একদিন এই পথ দিয়ে—চারশ' পঞ্চাশ বছর আগে।

———

ঘোষপাড়ার সতীমা ও আউলচাঁদ

ইংরাজী ১৬৯৪ সাল।

ফাল্গুন মাসের প্রথম শুক্রবার এক সুমধুর প্রভাতে উলা (বীর নগর) নিবাসী মহাদেব বারুই তার পানের বরজের দরজা খুললেন। প্রভাতের মৃদুমন্দ সমীরণে পানের পাতাগুলো যেন আনন্দে নৃত্য করছে। একটা চমৎকার মিষ্টি গন্ধ থেকে থেকে ভেসে আসছে। মহাদেব কিছুই বুঝতে পারেন না। রোজই তিনি বরজে আসেন কিন্তু এমনটিতো কোনদিন হয় না।

এগিয়ে গেলেন মহাদেব। মুখে শুধু "জয় গৌর" 'জয় গৌর" নাম। তাঁর সারা মুখ আঁধারে ঢেকে যায়। এই পথ দিয়েই তো একদিন নদীয়ার গোরাচাঁদ লীলা চলে চলে গেছেন। পথের মাঝে কত অন্ধ আতুর পাপীতাপী সব তাঁর স্পর্শে উদ্ধার হয়ে গেছে।

আর কি গোরাচাঁদ ফিরবেন না?

মহাদেব এগিয়ে চলেন বরজের ভিতর। চলতে চলতে এক সময় থেমে যান মহাদেব।

এমন সুদর্শন বালক এ বরজের মধ্যে কি করে এল? কে রেখে গেল? কখন রেখে গেল? মহাদেব কিছুক্ষণ স্থির তন্ময় হয়ে চেয়ে থেকে ডাক দেন, 'কে বাবা তুমি?

বালক কোনো জবাব দেয় না, শুধু হাসে।

সে হাসি যেন আলোর ঝরণার মত সমস্ত বরজে ছড়িয়ে পড়ে। হাসির মিষ্টতার রেশ চারিদিকে যেন সুমধুর মূর্চ্ছনা হয়ে ভাসতে থাকে।

মহাদেব বালকটিকে কোলে করে ঘরে তুলে নিয়ে আসেন। নিজের ছেলের মত সযত্নে লালন করতে থাকেন। মাঝে মাঝে তিনি বালকের দিকে চেয়ে থাকেন একদৃষ্টে। অন্তরে আশ্চর্য পুলক জমে ওঠে, মরি মরি, কি রূপ। এ রূপ কি কখনও মানুষে সম্ভব।

মহাদেব বালকের নাম রাখলেন পূর্ণচন্দ্র।

তৎকালীন প্রখ্যাত বৈষ্ণবাচার্য্য হরিহরের কাছে পূর্ণচন্দ্র সংস্কৃত ভাষা ও ধর্মশাস্ত্রাদি শিক্ষা করতে থাকে। হরিহরের কাছ থেকে বহু ছাত্র বিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত করে চলে গেছে, কিন্তু এমন আশ্চর্য ছাত্র তো হরিহরের জীবনে

কোনোদিন মেলেনি। পূর্ণচন্দ্রকে তো একবারের বেশী দু'বার কোন জিনিস দেখাতে হয় না, বোঝাতে হয় না। এমন প্রতিভাধর সন্তানের পিতা মাতা কারা? কিন্তু কেউ তো তা জানে না।

দেখতে দেখতে বিশটা বছর পার হয়ে গেল। হরিহরের কাছে পূর্ণচন্দ্রের পাট সমাপ্ত হল। হরিহর বৈষ্ণব ধর্মের যত কিছু সারমর্ম তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে উজাড় করে দিলেন পূর্ণচন্দ্রকে।

জ্ঞানদীপ্ত পূর্ণচন্দ্র এলেন ফুলিয়ায়।

বৈষ্ণব চূড়ামণি বলরাম দাস পূর্ণচন্দ্রকে দীক্ষা দিলেন বৈষ্ণব ধর্মে। পূর্ণচন্দ্র যেন জীবনের পূর্ণতা পেয়ে নবজীবন লাভ করলেন।

পূর্ণচন্দ্র হলেন আউলচাঁদ।

সাধক আউল চাঁদ কর্তা-ভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক রূপে দেখা দিলেন জন সমাজে। এদের প্রথম এবং প্রধান মন্ত্র 'গুরুসত্য।' এই মন্ত্র ছাড়া জীবের কোন মুক্তি নেই। মহাপাপীও যদি এইমন্ত্র জপ করেন তাহলে তার দিব্যধামে যাওয়ার পথ প্রশস্ত হয়ে যায়। সেইকালে এই কর্তাভজা দলকে বৈষ্ণব ধর্মের একটা শাখা বলা হত। নিজ ধর্মকে এরা সত্যধর্ম বা সহজ ধর্ম বলে থাকেন। এদের মতে কর্তা বা ঈশ্বরই জাতের স্রষ্টা আর গুরুই একমাত্র ঈশ্বরের প্রতিনিধি। ঈশ্বরের কাছে যাবার রাস্তা গুরুই তৈরী করে দেন। গুরুই ঈশ্বর ঈশ্বরই গুরু। ঈশ্বরকে চিনতে হলে আগে গুরুর আশ্রয় নিতে হবে। সত্যধর্মে যাঁরা দীক্ষিত হবেন তাঁরা একদিন ঈশ্বরের আসনেও অধিষ্ঠিত হতে পারেন। এই ধারণা তাদের প্রবল ছিল। যে ধর্ম মানুষকে দেবতার আসনে বসাতে পারে সে ধর্ম সত্যধর্ম।

এই সত্যধর্মের নিশান তুলে ধরেন সাধক আউল চাঁদ।

কর্তা-ভজা সম্প্রদায়ের মধ্যে সে সময় একটা বিশ্বাস বিস্তবান ছিল যে মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য নীলাচলের পথে অন্তর্ধান করার পর আবার তিনি সাধক আউল চাঁদ রূপে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন। সেই সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন সাধকদের সাধন বিষয়ে এক একজনের বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রত্যেকেরই সাধন ভজনের মধ্যে একটা গভীর রহস্য থাকত। কর্তা-ভজাদেরও সাধন পথে কিছু কিছু রহস্য ছিল। সেই সাধন বিষয় নিজ সম্প্রদায় ছাড়া অন্য কারো জানার অধিকার ছিল না। এদের দিনে পাঁচবার মন্ত্র জপ করতে হত। শুক্রবার হল এদের কাছে একটা পবিত্র দিন। এই দিনটির সব প্রহর এরা সাধন ভজন করে কাটাতো।

সাধন ক্ষেত্রে এরা জাতি ভেদ মানত না। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে জাতিভেদ পুরোপুরি মেনে চলত। মানুষকে এরা সত্য বলে মানত কিন্তু সত্যানুসন্ধানের প্রবৃত্তি যাতে সব মানুষের মধ্যে জাগ্রত হয় সে চেষ্টাও তারা করত।

আউলচাঁদের বাইশ জন শিষ্য ছিল। তাদের মধ্যে সদ্‌গোপ বংশীয় রামশরণ পাল আউলচাঁদের দেহরক্ষার পর গুরুপদ প্রাপ্ত হন। তিনি ঘোষ পাড়ায় থেকে এই সম্প্রদায়ের পরিচালনা করবার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন। বর্তমানেও এই রামশরণ পালের বংশধরেরাই ঘোষপাড়ায় সত্যধর্মের প্রচার কার্যে রত আছেন।

রামশরণের স্ত্রী অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা নারী ছিলেন। সকল শ্রেণীর মানুষকে তিনি আপন জন ভেবে কাছে টেনে নিতেন। মানুষই তো দেবতা। নারায়ণের অংশ নিয়েই তো এরা নররূপী নারায়ণ।

শিষ্যরা তাঁকে 'সতীমা' নামে অভিহিত করেন। 'সতীমার' অলৌকিক সাধন ক্ষমতা বাংলার বিশিষ্ট ধর্মের মধ্যে এক বিশেষ আসন নিয়ে আছে। সতীমার আবির্ভাব এক যুগান্তকারী শক্তির উৎস। ভগবান যুগে যুগে ধরাধামে আসছেন। ভগবান ছাড়াতো একটা কণাও কোথাও নেই। সবাইতো তাঁর আশ্রিত। আকাশ বাতাস বন-উপবন, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত কোথায় তিনি নেই ?

সতীমার মধ্যেও তাঁর প্রকাশ দেখা গিয়েছিল। অকালে তখন ঘোষ পাড়ায় ঠাকুর বাড়ীতে রথযাত্রার উৎসব হত। বৈশাখীর পূর্ণিমার প্রতি বছর এই উৎসব।

অকালে রথযাত্রা উৎসব মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে সুখী করতে পারেনি। তিনি অত্যন্ত কুপিত হয়ে ঘোষ পাড়ায় এলেন রথযাত্রা উৎসব বন্ধ করতে।

কিন্তু অবাক বিস্ময়ে তিনি দেখলেন নিজ চোখেসতীমার সাধন বলে বলীয়ান রথ আপনা আপনি এগিয়ে চলেছে।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই অলৌকিক ঘটনা চাক্ষুষ অবলোকন করে বুঝলেন, সতীমা এক মহাশক্তির অধিকারিণী এবং তিনি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

সতীমার সমাধিস্থল, ডালিমতলা ঘোষ পাড়ার একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থল। কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে একবার রাম শরণের স্ত্রী কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। আউলচাঁদ তখন নিকটস্থ পুষ্করিণী থেকে কিছু মৃত্তিকা এনে তাঁর গায়ে মাখিয়ে দেন। তিনি রোগ মুক্ত হন এবং নবজীবন লাভ

করেন। আউলচাঁদ তাঁর সন্তান রূপে আবার জন্ম গ্রহণ করবেন এই আশ্বাস বাণী দিয়ে আশ্চর্য ভাবে অন্তর্হিত হয়ে যান। প্রবাদ আছে যে তিনিই রামশরণের পুত্র রামদুলাল রূপে জন্মগ্রহণ করেন।

ঘোষ পাড়ায় হিম সাগর নামে একটি দীঘি আছে। অনেকের বিশ্বাস যে এর জলে রোগ আরোগ্য করবার আশ্চর্য্য শক্তি আছে। হিমসাগরের জল চোখে দিয়ে একজন অন্ধ নাকি দৃষ্টি শক্তি লাভ করেছিল।

রথযাত্রা আর দোলের সময় ঘোষ পাড়া যেন এক নতুন মোহময়ী রূপ ধারণ করে; এখানকার দোলের মেলা বাংলার এক প্রসিদ্ধ মেলা। মেলা চলে সপ্তাহকাল, দেশ বিদেশের অগণ্য বিচিত্র মানুষ আসে, মেলায় ভীড় করে।

কাঁচড়া পাড়া রেল স্টেশন থেকে পাঁচ মাইল দূরে ঘোষপাড়া। কল্যাণী থেকে দু'মাইল পথ। পদ পথ ছাড়াও বাস, রিক্সায় এখন যোগাযোগ নিবিড়।

ইদানীং কালে যানবাহনের প্রাচুর্য্যে মানুষ তীর্থভূমিকে টেনে এনেছে আঙ্গিনায়। দেব-দেবতার দর্শন, পুণ্য সঞ্চয় হয়েছে সহজ। শুধু মাত্র মন তৈরী হয়েছে কিনা সবার সেইটাই হচ্ছে সন্ধানের বিষয়।

মন তৈরী থাকলে দেব দেবতাও দূরে থাকবে না, একদিন দেখা যাবে দৃষ্টির অলক্ষ্যে চুপি-সারে কখন তিনি এসে বসেছেন পুণ্য মনের হৃদয় সিংহাসনে।

কাঞ্চনপল্লীর কৃষ্ণরায়জীর মহোৎসব ও মেলা

প্রাচীন নাম নবহট্ট।

তারপর হোল কাঞ্চনপল্লী।

বর্ত্তমান নাম গ্রাম কাঁচরাপাড়া।

যেমন দেবতার নানান্ নাম, তেমনি গ্রামের নামও হরেক রকম। একই জায়গা, একই পরিবেশ, একই মন্দির, একই দেবতা। নাম হোল তিন রকমের।

পথ অনেক পথিকও বিভিন্ন, লক্ষ্যবস্তু এক্।

নামে কি আসে যায়! নামীর সন্ধানই তো আসল।

কাঁচরাপাড়া রেলষ্টেশনে নেমে কল্যাণী বা বারাকপুরের বাসে এসে বাঘের মোড়, সেখান থেকে মিনিট পাঁচেক গেলেই কৃষ্ণরায়ের মন্দির।

আরও কিছুদুর এগিয়ে গ্রামের মধ্যে ঢুকলে বাংলার এক মহাকবি ঈশ্বর গুপ্তের জন্মভিটা। আগে এসব জায়গা বন জংগলে ঘেরা ছিল—বর্ত্তমানে জংগল কেটে বসত হোয়েছে।

কৃষ্ণরায়ের মন্দির দর্শনীয় মন্দির।

মন্দিরটি আধচালার মত, এর উচ্চতা ও দৈর্ঘ্য অনেকটা শান্তিপুরের শ্যামচাঁদের মন্দিরের মত। মন্দিরের মাথার দিকে ফুলের কারুকার্য্য করা। মন্দিরগাত্রে কোন দেবদেবীর মূর্তি খোদাই করা নেই। মন্দিরের দক্ষিণ দিকে একটা লিপিফলক আছে। সম্পূর্ণ অংশটা নীচু থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় না। মন্দিরের সামনে বিরাট প্রাঙ্গন। আগে মন্দিরের চারপাশ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। তখন মন্দিরে প্রবেশ করতে গেলে সিংহদরজা ও নহবতখানা পার হয়ে মন্দিরে প্রবেশ করতে হোত।

এখন আর সে প্রাচীরও নেই, নহবতখানাও নেই। শুধু মন্দিরটি আছে, আর মন্দিরের ভিতর কৃষ্ণরায়জী।

পূর্বদিকে প্রাচীরের বাইরে একটা বিরাট দোলমঞ্চ ছিল। প্রতি বছর দোলের সময় তখন ধূমধাম করে দোল উৎসব হোত। কত মানুষ আসতো, মেলাও বসতো। এখন আর সে রকম জাঁক জমক করে দোল উৎসব হয় না—ঐ নমঃ নমঃ করে যেটুকু হয়।

মন্দিরে যে লিপি-ফলক আছে, তা থেকে বলা যায় যে এই মন্দিরের কৃষ্ণরায় বিগ্রহটি চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত শিবানন্দ সেনের ছিল। অনেকে এ জায়গাকে শিবানন্দের পাট বলেন। চৈতন্যদেব শিবানন্দ সেনের বাড়ীতে এসেছিলেন, সেই সময় এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত পুত্র কচুরায় গঙ্গার ধারে কৃষ্ণরায়ের একটা মন্দির নির্মাণ করেন। কিন্তু কালের করালগ্রাসে একদিন সেই মন্দিরটি গঙ্গাগর্ভে ডুবে যায়।

এই সংবাদে কোলকাতার দুই মহান ব্যক্তি নিমাই চরণ ও গৌরচন্দ্র মল্লিক অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন এবং তাঁরাই দুইজন ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করেন।

এই কৃষ্ণরায় সম্বন্ধে জনশ্রুতি আছে যে, তৎকালে শিবানন্দ সেন এ অঞ্চলে সর্বশ্রেষ্ঠ কবিরাজ ছিলেন।

একবার বাংলার নবাব অসুস্থ হয়ে পড়ায় কবিরাজ শিবানন্দ সেনকে ডেকে পাঠান।

শিবানন্দ সেনের চিকিৎসায় নবাব সম্পুর্ণ সুস্থ হোয়ে উঠেন। তিনি কবিরাজকে পুরস্কৃত করতে চাইলেন এবং কি পারিশ্রমিক তিনি নেবেন জানতে ইচ্ছে করেন।

কবিরাজ শিবানন্দ সেন টাকা, পয়সা, সোনা দানা, জমি জায়গা কিছুই চাইলেন না। তিনি নবাবের ঘরে ঢুকতে দরজার খিলানে আঁটা একখানা প্রস্তরখণ্ড চেয়ে বসলেন।

কেন চাইলেন তিনি ঐ প্রস্তরখণ্ড?

শিবানন্দ যখনই নবাবের ঘরে যেতেন, তখনই দেখতেন যে ঐ প্রস্তরখণ্ড ঘামে স্নান করে উঠত এবং ঢুকতে ও বের হতে তাঁরই মাথায় ঐ ঘামের জল পড়ছে। অন্য সময় কিছুই দেখা যায় না। ভক্ত শিবানন্দ যেন শুধু কবিরাজ নন।

তিনি তো রোগী!

কি রোগ তাঁর?

কৃষ্ণধন কি করে পাওয়া যায় সেই চিন্তাতেই তিনি রোগী হয়ে গেছেন। এ রোগের ওষুধ তো একমাত্র সেই ভববৈদ্য কৃষ্ণরায় ছাড়া আর কে দিতে পারেন?

তিনি ভেবে নিয়েছিলেন ঐ প্রস্তর খণ্ড শুধু প্রস্তরই নয়, ওর মধ্যে এমন কেউ আছেন যিনি বড় দয়াল। যিনি চোখের জলে কলির জীবকে তাঁরই

শরণাপন্ন হতে বলছেন।

এই ধারণার বশবর্তী হয়েই তিনি চিৎকিৎসার বিনিময়ে ঐ প্রস্তর খণ্ড চেয়ে বসলেন।

নবাব অবাক বিস্ময়ে বললেন, এ দুনিয়ায় কত ঐশ্বর্য্য থাকতে কবিরাজ মশায় অপনি ঐ প্রস্তর খণ্ড চেয়ে বসলেন!

শিবানন্দ সেন বললেন—হ্যাঁ নবাব বাহাদুর, আমি ঐ প্রস্তরখণ্ডই চাই।

নবাব বললেন: বেশ তাই হবে?

সংগে সংগে মিস্ত্রী ডেকে খিলান ভেঙে ঐ প্রস্তর খণ্ড বের করা হল।

:—সবই তো হোল, এখন কবিরাজ মশায় এটা নেবেন কি করে—এর ওজন তো কম নয়!

:—আপনি নদীতে ফেলে দেবেন, তাহলেই আমি পাবো।

:—কি আশ্চার্য্য, জলে কি কখনও শিলা ভাসে!

:—হ্যাঁ ভাসে! তাঁর কৃপাতে সবই সম্ভব।

:—বেশ তাই হবে!

শিবানন্দ সেন নদীপথে নৌকাযোগে ঘরের দিকে যাত্রা করলেন। বেশ কয়েকদিন পরে তিনি ফিরে এলেন নিজ গ্রামে কাঞ্চনপল্লীতে। বারে বারে এদিক ওদিক চেয়ে দেখেন—না, প্রস্তর খণ্ড এখনও পৌছায়নি।

শিবানন্দ কাঁদছেন।

দুচোকে তাঁর জলের ধারা।

রাতে ঘুম হোল না।

ভোর হোতে না হোতেই তিনি গঙ্গার ঘাটে ছুটলেন। এসে দেখলেন প্রস্তরখণ্ড গঙ্গার মধ্যে গড়াগড়ি যাচ্ছে। তিনি লাফ দিয়ে জলে নেমে জড়িয়ে ধরে বললেন—তাহলে সত্যিই তুমি এলে প্রভু!

লোকজন ডেকে তিনি প্রস্তরখণ্ড বাড়ী নিয়ে গিয়ে মিস্ত্রী ডেকে প্রস্তরখণ্ড দু' টুকরো করতেই রাধাকৃষ্ণের মূর্তি বের হোল। শিবানন্দ সেন মাটিতে গড়াগড়ি যান আর চোখের জল ফেলেন। এই মূর্তিই কৃষ্ণরায়জী নামে আজও কাঞ্চনপল্লীর মন্দিরে পুজীত হোচ্ছেন।

"অদ্যাবধি সেই লীলা করেন গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥"

ভাগ্যবান শিবানন্দ ধন্য—ধন্য তাঁর কৃষ্ণভক্তি !

* * *

একটা উঁচু পাদপীঠের ওপর অবস্থিত এই মন্দিরটি। সামনে বারন্দা আছে—গর্ভগৃহে কৃষ্ণরায়ের বিগ্রহ একটা সিংহাসনে বসানো আছে।

আজকের গ্রাম কাঁচরাপাড়ার কৃষ্ণরায়জীর মন্দিরের সে শোভা আর নেই—চারিদিক থেকে চুণবালি খসে পড়ছে। বাইরে এই দৈন্যদশা; কিন্তু ভিতরে মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণরায়জী মহা সমোরে হে সিংহাসনে বসে আছেন।

বিগ্রহের পদ্মাসনে সংস্কৃতে একটা শ্লোক লেখা আছে—

"স্বস্তি শ্রীকৃষ্ণ দেবায় প্রভুরাসীৎ স্বয়ং কলৌ।
অনুগ্রহায় দ্বিজঃ কিঞ্চিৎ শ্রিয় শ্রীনাথসংজ্ঞকা ॥"

আজও কত লোক এ পথে আসে, কত দিকে চলে যায়। কেউ কেউ এখান থেকেই প্রণাম করে কৃষ্ণরায়জীকে। দোলে জন্মাষ্টমীতে, ঝুলনে কিছু লোকজন আসে, পূজো দেয়।

যদি কখনও এ পথে আসেন, দেখে যাবেন কৃষ্ণরায়জীকে। তিনি তো সকলকেই দেখছেন—

আপনিও না হয় একবার নিজেকে দেখান।

অষ্টমদোলের মেলা

"তারে কই পেলাম সই যার জন্য হ'লাম পাগল,
ব্রহ্মা পাগল, বিষ্ণু পাগল আর পাগল শিব।
তিন পাগলে যুক্তি কোরে ভাঙলো নবদ্বীপ ॥
আর এক পাগল দেখে এলাম বৃন্দাবন মাঝে।
রাইকে রাজা সাজায়ে আপনি কোটাল সাজে ॥
আর এক পাগল দেখে এলাম নবদ্বীপের পথে।
রাধা প্রেম সুধা বলে করোয়া কীর্তি হাতে ॥"

পাগলে ভরা এ দুনিয়ার মাটি।

এ মাটিতে প্রেম সুধা বরষণ হোয়েছে বহুকাল আগে। ভাবের ফসল অনেক ফলেছে সেই বরিষণে। আজও যা ভাবের পাগল দেখি তা ঐ বরিষণেরই ফল।

নদীয়ার পাগল গৌরাঙ্গদেব এ মাটি কৃষ্ণনামের লাঙলে এমনভাবে কর্ষণ কোরেছেন যে মানুষ কেঁদে কেঁদে এ মাটি ভেজাচ্ছেন। নবদ্বীপ থেকে সুরু করে মায়াপুর, ফুলিয়া, কাটোয়া, আদি সপ্তগ্রাম, শান্তিপুর, বিরহী, কুলিয়া, মদনপুর সব জায়গাতেই পাগল গোরার চোখের জল পড়েছে।

কাঁদলে বুঝি কৃষ্ণ মেলে?

হ্যাঁ মেলে। কিন্তু কৃষ্ণ ছাড়া মন হলে আর মেলে না।

নিতাই কেঁদেছে একদিন—

"কই কৃষ্ণ এলো কুঞ্জে প্রাণ সই
দে রে কৃষ্ণ দে, কৃষ্ণ এনে দে
রাধা জানে কি গো কৃষ্ণ কই

গৌরাঙ্গের লীলার অন্ত নেই—

নদীয়ার সর্বত্রই তাঁর লীলা।

কুলিয়ার পাটে অপরাধ ভঞ্জনের পাঠ শেষ হোল। এবার লীলা মদনপুরে অষ্টম দোলের দিনে।

সামনের ৯ই চৈত্র ইংরাজী ২৩শে মার্চ মঙ্গলবার মদনপুরে অষ্টম দোলের উৎসব। মদনপুরে মহাপ্রভুর মন্দিরে হবে দোল লীলা।

ইষ্টার্ণ রেলের কোলকাতা রানাঘাট শাখায় মদনপুর ষ্টেশনে নেমে পূবদিকে পাঁচ মিনিটের পথ গেলেই মন্দিরে পৌঁছানো যাবে। কোলকাতার দিকে যাবার সময় শিমুরালি ষ্টেশন ছাড়িয়ে কিছুদূর গেলেই একটা মাট পড়ে। তারই ওপাশে দেখা যাবে তাল নারকেল গাছের সারি—তার মাঝেই মন্দির। ট্রেন থেকেও দেখা যায়।

মন্দিরে গৌর নিতাই-এর কাঠের মূর্তি, নিত্য সেবা চলছে আর অষ্টম দোলের দিনে উৎসব। তিন দিন ধরে বিরাট মেলা বসে।

আমি তো কয়েকবার ঘুরে এসেছি—

এবার আপনাদের যেতে অনুরোধ জানাই। কত যায়গা বেড়ালেন, হরিদ্বার থেকে হয়তো কন্যাকুমারী পর্যন্ত।

ঘরের কাছে যে এক পড়শী বাস কোরছেন তাঁকে একবার দেখুন। এ পড়শী তো আর কেউ নয়, এ যে আপনার আত্মার আত্মীয় পরম করুণাময় মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব।

ট্রেন থেকে নেমে পূবদিকে পীচের রাস্তা ধরে সোজা চলে যান। দেখবেন মেলা বসেছে। পুতুলের দোকান, কাঠের জিনিষ আর পাথরের বাসন, মনোহারী দোকান বসেছে সারি সারি--এরই মাঝখান দিয়ে চলে যাবেন শেষ প্রান্তে। ওখানেই মন্দির—গৌর নিতাই দুই ভাই হাত উঁচু কোরে সবাইকে ডাকছেন। তিনি তো শুধু একজনকেই ডাকছেন না; তিনি ডাকছেন অনন্ত বিশ্বের মানুষকে শুধু নয়, কীট-পতঙ্গ পশুঃপাখী সবাইকেই ডাকছেন।

সন্ধ্যার আগে গৌর-নিতাই কাঁধে কোরে আবির খেলা আর সঙ্কীর্তন। দেখার জিনিষ, মনে হবে মহাপ্রভু নিজেই দোল দেখছেন আর যেন বোলছেন—

"কই প্রভু কই মম কৃষ্ণভক্তি হোল
অধম জনম বৃথা কেটে গেলো
বল প্রভু কৃষ্ণ কই
কৃষ্ণ কোথায় পাবো
দেহ পদধুলি বনমালী যেন পাই।"

মহাপ্রভু কোথায় নেই। সর্বত্রই তো তিনি। কিন্তু এখানে এলেন কি ভাবে? এ মন্দিরই বা কে গড়লো?

সে কথা এবার বলি—

১৯৫০ সালে ৺হীরালাল অধিকারী আর তাঁর আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক এই

মন্দির প্রতিষ্ঠা হোয়েছে। পাবনা জেলার স্থল নামক জায়গায় এই মূর্তি ছিল। সেখানেও নিত্য পূজা হোত আর অষ্টম দোলের দিন উৎসব হোত মেলাও বসতো। ১৯৫০ সালের কোন সময় উক্ত অধিকারীমশায় গৌর-নিতাই-এর মূর্তি দুটো নিয়ে হিন্দুস্থানে চলে আসার সময় পাকিস্তান কর্ত্তৃপক্ষ আটক করে গোয়ালন্দ ষ্টেশনে।

দুনিয়ার মানুষকে যিনি বাঁধছেন আর খুলছেন তিনি আটক পড়লেন গোয়ালন্দের ঘাটে। তাঁকে আটকাবে কে? তিনি যদি আসতে চান তবে রজ্জু দিয়ে কে বাঁধতে পারে। হ্যাঁ বাঁধতে পারে সেই যে প্রেম ভক্তির রজ্জু দিয়ে বাঁধবে। আটকাতে সেই পারে যার কাছে আছে ভালবাসার শিকল।

যাঁরা মূর্তি দুটো আনছিলেন তাঁরা মহাবিপদেই পড়লেন। সেবা পূজা বন্ধ —তিনদিন মহাপ্রভু উপবাসী, ৺হীরালাল অধিকারীর চোখে জল, তিনিও উপবাসী।

সংবাদ গেলো মহকুমা সহর রাজবাড়ীতে। মহাকুমা শাসক বাঙালী মুসলমান বসিরুদ্দিন সাহেব।

তিনি এসে বোললেন:—এ হয় না, হোতেও পারে না। ছেড়ে দাও, নইলে মহাসর্বনাশ হবে।

মহাপ্রভু ছাড়া পেলেন।

আবার ট্রেনে উঠলেন। সঙ্গে এলেন বসিরুদ্দিন সাহেব। সোজা তিনি গৌর নিতাইকে পাহারা দিয়ে দর্শনায় এসে সীমানা পার কোরে দিয়ে চলে গেলেন।

ভাগ্যবান বসিরুদ্দিন সাহেব।

ভবনদীর কাণ্ডারী যিনি, দীন দুণিয়ার মালিক যিনি, তাঁকে তিনি মাঝি হোয়ে পার কোরে দিয়ে গেলেন।

মহাপ্রভু বেলেঘাটার রাজবাড়ীতে এসে উঠলেন। নিত্য সেবা পূজা চলতে থাকে। তার পর একদিন তিনি মদনপুরে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করেন। সেই থেকে মহাপ্রভুর সেবা পূজা চলছে।

বর্ত্তমানে অধিকারী বংশের বংশধর বিনয় অধিকারীকে দেখলাম। এবারও তিনি এসেছিলেন আমাকে আমন্ত্রন জানাতে।

মহাপ্রভু দর্শন কোরব তার আবার আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ এ তো মহা ভাগ্যের কথা।

কেননা আমরা মানুষ। আমাদের চাওয়া-পাওয়া নিয়ে সংসার। জয়-পরাজয়ের যুদ্ধ চলছে অবিরাম আমাদের জীবনে। আমাদের ভাগ্যে দেবদর্শন একমাত্র তাঁর অনুগ্রহ ছাড়া অসম্ভব।

আমি কেন হংসবাবা অবধূতের মত বোলতে পারবো না—

"চা গেয়ি, চিন্তা গেয়ি মন্‌সে নাহি প্রবাহ
জিস্‌ মন্‌সে সন্তোষ হ্যায়, উয়ো শাহেনশাহ।"

অর্থাৎ যার কোন চাওয়া নেই, চিন্তা নেই অন্তরে যার বিরাজিত কোরছে চির সন্তোষ তিনি যে সত্যই এক শাহেনশাহ রাজাধিরাজ।

———

মনসাপোতার মনসার পূজা ও মেলা

শিয়ালদহ সেকসানে শিমুরালী ষ্টেশন।

ষ্টেশনের মাধুর্য্য তেমন নেই। ছোট ষ্টেশন ঘর। দিনে রাতে অনেক ট্রেনই থামে। কিছু কিছু ট্রেন আবার থামে না সোজা চলে যায়। হাত দেখালেও থামবে না, কারণ তার তো থামবার কথা নয়।

যে সব ট্রেন থামে তারই যে কোন একখানা চড়ে আপ থেকে হোক আর ডাউন থেকে হোক, যদি কোনদিন কেউ শিমুরালী নামেন তাহলে দেখার জিনিষ কিছু মিলতে পারে।

যদি একান্তই আসেন তাহলে আসুন ভাদ্রের সংক্রান্তির দিন। কারণ ঐ দিনই এখান থেকে কিছু দূরে মনসাপোতা গ্রামে মা মনসার পূজা ও মেলা হয়। আপ প্লাটফরম থেকে নেমে সোজা চলে গিয়ে বাঁ দিকে যে একপায়ে চলার মাটীর পথ আছে সেই পথ দিয়ে সোজা চলে যাবেন মনসাপোতা গ্রামে। দু' পাশে জঙ্গল, তাতে আপনার ভয়ের কারণ নেই। তরলা বাঁশের কঞ্চি হয়তো আপনার জামা টেনে ধরবে। লতাপাতা বন-বাদাড় হয়তো আপনার পা জড়িয়ে ধরতে পারে, তাতেও কোন সঙ্কোচ নেই। আপনি চলতে থাকুন। পথের বাঁক পর্যন্ত গিয়ে থেমে যান। খুব ক্লান্ত লাগছে নাকি! না না, পথ তো ষ্টেশন থেকে বোধহয় তিন পোয়া মাইল হবে। এ আর এমন কি দূর পথ।

সামনে চেয়ে দেখুন প্রায় পনেরো কাঠা জমির ওপর দু'তলা সমান ঢিপি। ঢিপির সারা অংশে বন-জঙ্গল, ডুমুর গাছ, তাও আবার তেলাকুচার পাতার আলিঙ্গনে অদৃশ্যপ্রায়। ঐ ঢিপির সারা গায় হাজার হাজার গর্ত। মনে হয় লাখো লাখো সর্প এখানে এসে তাদের সংসার পেতেছে। কখনও কখনও দেখা যায় গোটা কয়েক সর্প শিশু গর্ত থেকে বেরিয়ে বন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আবার একটা অন্য গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ল। যেন বাইরের ঘর থেকে শোবার ঘরে চলে গেলো। এ অঞ্চলটায় এত জঙ্গল যে দিনের বেলাতেই এদিকে আসতে গা ছমছম করে।

প্রায় একতলা সমান জায়গাটা—যেখানে দেখবেন আট দশ হাত মত বুনো ঘাস আছে। ঠিক ঐখানেই প্রতি বছর ভাদ্রমাসের সংক্রান্তির দিন মনসার পূজা হয়। ঢিপির আশেপাশে যেখানে ফাঁকা জায়গা আছে সেখানে ছোট খাটো একটা মেলা বসে। মেলা বোলতে যা বোঝা যায় তা নয়। কারণ

সার্কাসও আসে না, দুই মাথাওয়ালা মানুষ দুই মুখে তাঁবুর মধ্যে কথাও বলে না। আসে ঐ অঞ্চলের কিছু কিছু তেলেভাজার দোকান, কিছু আসে মাটির পুতুল আর আসে আলতা-সিন্দুর, কাঁচের চুড়ীর দোকান। চটকদারি দোকান সাজিয়ে কেউ এখানে বসে না। পুজোর দিন যারা আসেন তাঁরা আশ পাশের গ্রাম থেকে আসেন। দূর-দূরান্তর থেকে মানুষ বড় একটা আসে না। কারণ অনেকেই জানে না যে এরকম একটা জায়গায় মা মনসার পুজা হয়। তাছাড়া মেলা দেখতে যাঁরা আসেন তাঁরা মেলাই দেখেন। পুজা আর মেলা দুইই সমানভাবে আর ক'জন দেখে।

আপনি পুজো দেখছেন কিছু দূরে দাঁড়িয়ে, কিন্তু আপনার অনুসন্ধিৎসু মন ঘুরে বেড়াচ্ছে কারণের পেছনে। সত্যিই তো এখানে এতবড় ঢিপিটা হোল কি কোরে। কেইবা পুজা কোরে, কত কালের কথা, কেউ কি প্রত্যক্ষ কোরেছেন, কোন আশ্চর্যজনক ঘটনা।

এসব নিশ্চয়ই মনে আপনার দোলা দেবে। কারন আপনি শুধু মেলা তো দেখতে আসেননি। এসেছেন সব কিছু জানতে। এসেছেন এর ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হোতে।

এবার শুনুন তাহলে মনসা পোতার ইতিবৃত্ত। বহু, বহুকাল আগে এখান দিয়ে গঙ্গা বয়ে যেতো। আজ সেই গঙ্গা সরে গেছে কালীগঞ্জের কাছে ভাগিরথী বি, টি কলেজের কোল দিয়ে। বছরের প্রায় অধিকাংশ সময় এখানে গঙ্গায় মাঝে মাঝে চড়া, মাঝে মাঝে জল থাকে। বর্ষাকালে গঙ্গা নিজের রূপ ধরে। জনশ্রুতি আছে যে চাঁদ সদাগর বাণিজ্য কোরতে যাবার সময় লোকজন নিয়ে ডিঙিতে কোরে এখানে একদিন এসে থামেন সেদিন আবার ছিল মনসা পুজার দিন।

কোথায় পুজো কোরবেন ঠিক কোরতে না পেরে মনসা পোঁতা জায়গাটাই তাঁর পছন্দ হয়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে লোকজন নিয়ে তড়িঘড়ি মাটি কাটিয়ে এই দোতলা সমান ঢিপি তৈরি করে তার উপর পুজো করেন। উঁচু ঢিপি করার অর্থ হোল যাতে কারও পা না লাগে—সমতল জায়গায় পুজো কোরলে সেখান দিয়ে মানুষ চলাফেরা কোরবে, তাই তিনি এই ব্যবস্থা করেন। পরদিন তিনি মনসাপোতার ঐ জায়গাটা কিনে নেন।

এ সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে আমরা দেখি—

'শতমুখী ছাড়াইল বাও বাও করি
সম্মুখে গঙ্গার বাঁক দেখে অধিকারী ॥
দীপ ধূপাদি আর সুগন্ধি চন্দন।
নানা উপাচারে পূজি করিল গমন।
দেবতা গন্ধর্বে যথা পূজে অবিরাম।
মনসা পূজিলে হয় সিদ্ধ মনস্কাম ॥

চাঁদ সদাগর এই গ্রামেরই একজনকে পূজো করার জন্য ঠিক কোরেছিলেন এবং তার মাসোহারারও ব্যবস্থা কোরেছিলেন। আজকের যে পুরোহিত পূজো করেন, তিনি চাঁদসদাগরের নিযুক্ত পুরোহিতেরই বংশধর। বর্তমানে যিনি পুরোহিত তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বোলেছেন যে মাসোহারা অনেকদিন বন্ধ হোয়ে গেছে।

আরও বোলেছিলাম, সেটেলমেণ্ট অফিসে খোঁজ নিলে কার নামে এই পূজোর জায়গাটা আছে দেখা যাবে কি ?

পুরোহিত বোললেন—না তা পাবেন না, তবে আমাদের কাছে যে কাগজ-পত্তর আছে, তাতে আমাদের নামেই এ জায়গাটা তা উল্লেখ আছে।

পুরোহিত মশাইয়ের বাড়ীর উঠানে একটা বাতাবী লেবুর গাছ আছে। সেই গাছের তলার দিকে একটা ফোকর আছে। তিনি বোললেন—এই ফোকরের মধ্যে সম্পূর্ণ সাদা রঙের একটা সাপ আছে। রোজ রাত আটটার সময় সে উঠে এসে এক বাটি দুধ খেয়ে যায়। আপনারা অপেক্ষা কোরলে দেখাতে পারি।

কিন্তু সঙ্গীরা কেউ অপেক্ষা কোরতে না পারায় চলে আসতে বাধ্য হই। আজও নাকি সেই একই সময় ঐ সাপটা এসে দুধ খেয়ে যায়।

এই মনসাপোতাতে আজও পর্যন্ত কোনদিন কাউকে সাপে কাটেনি। এ অঞ্চলের মানুষ দিনরাত চলাফেরা করে নির্ভয়ে। মনসাপোতার একপাশে একটা প্রাইমারী স্কুল আছে। স্কুলের ছেলেমেয়েরাও সবসময় আসা-যাওয়া কোরছে। কোন ভয়ই যেন তাদের নেই।

আজকাল সিনেমা যাত্রা ও থিয়েটারে মানুষ পাগল। কিন্তু বহুকাল আগে এসবের বেশী প্রচলন ছিল না। গ্রামাঞ্চলে, গঞ্জে বা দূরের পল্লীতে মনসার ভাসানের দল ছিল। হিন্দু-মুসলমান সবাই তাতে অংশগ্রহণ কোরত। আজ থেকে ৪০ বছর আগে আমি রাত জেগে মনসার ভাসান শুনেছি। ভাসান

যাত্রায় লখিন্দরের বাসরের দৃশ্য এখও আমার মনে আছে। বেহুলা ও লখিন্দর গভীর ঘুমে অচেতন, এমন সময় লখিন্দরকে কালনাগে দংশন কোরল। উপানন্দ নামে একজন লখিন্দর সেজেছিল।

সে বোলে উঠলো—

"ওঠরে বেহুলা সুন্দরী
সায়বেনের ঝি।
তোরে পাইল কালনিদ্রা
মোরে খাইল কি!"

লখিন্দরের সারা দেহ বিষে নীল হোয়ে গেল। মুসলমানের ছেলে আজিজুল বেহুলা সেজেছে—কি অপরূপ চেহায়া তার।

কেঁদে কেঁদে তার সেই যে গান—

"মুই অভাগিনী বালা, না জানিলাম রসকলা,
না পুরিল মনের আরতি।
সাজিয়া উত্তম বেশে, বিয়া কৈলা অভিলাষে
সুখভোগ না করিলাম কেলি।
তাতে দৈব হেন কৈল, কাল রাত্রিতে প্রভু মৈল
মুই রাড়ী ছাড় কপালী।"

সারা আসরের মানুষ চোখের জলে ভাসছে।

আজ পরিবর্তনের যুগে সে সব কোথায় হারিয়ে গেছে কে জানে। আজও দূর পল্লীর অভ্যন্তরে সারা ভাদ্রমাস ধরে নিত্য মনসা মঙ্গল পাঠ হয় সুর কোরে। গ্রামের বৃদ্ধ-যুবা-বৌরা সবাই এসে জড়ো হোয়ে সেই পাঠ শোনে।

মনসাপোতায় যে কোন সময় এলেই বেহুলা লখিন্দরের কথা মনে পড়ে যায়। শিমুরালী ষ্টেশন শেষে লাইনের ধারে একটা গুমটি ঘর আছে। সেখানে একজন পোর্টার নিযুক্ত আছে। বহুকাল আগে একজন পোর্টার থাকতো এই গুমটি ঘরে। একদিন সন্ধ্যার পর গ্রামের ভিতর যাবার সময় সেই একপেয়ে রাস্তার ওপর একটা খেজুর গাছের মত কি যেন দেখতে পায়। হাতের লণ্ঠনটা নিয়ে এগোতে গিয়ে সে চমকে ওঠে গাছটাকে নড়তে দেখে। ভয়েতে পিছু হটে এসে সে দেখে যে ওটা খেজুর গাছ নয়—একটা বিরাট সাপ। সঙ্গে সঙ্গে সে শুনতে পায়, কে যেন বোলছে—যা দেখলে, তা যেন কাউকে বোল না। তাহলে গলায় রক্ত উঠে তোমার মৃত্যু হবে।

কিন্তু সে পোর্টারটি সবাইকে একথা বোলে দেয়। যা হবার তাই হোল। একদিন সকালে তার রক্তাক্ত মৃতদেহ গুমটির কাছে পাওয়া যায়। একথা এখানে সবাই জানে—অনেকের মুখে এ ঘটনার কথা শুনেছি। যিনি বিশ্বাস কোরবেন তিনি ঠিকই বিশ্বাস কোরবেন। প্রবাদ জনশ্রুতি, লোকাচার মুখে শুনেই তো আমরা এসব জানি, পত্র-পত্রিকায় লিখি, বইতে লিখি—চিরকাল তাই সত্য হোয়ে থাকে। এ সত্য কোনদিন মহাকালের শ্লেট থেকে মুছে যায় না।

বনজঙ্গলে ঘেরা মনসাপোতার ঢিবির কাছ দিয়ে যারা চলাফেরা করেন, তাঁরা মা মনসার উদ্দেশ্যে একটা প্রণাম না কোরে যান না। মনসাপোতা যেন মনসারই নিকেতন। এ গ্রামের মানুষ তাই ভাদ্রমাসের সংক্রান্তির দিন হাজার কাজ ফেলে এই ঢিবিতে এসে পুজো দেয়।

চাঁদসদাগর কোথায় ভেসে গেছে। বেহুলা ও লখিন্দর আজও যেন বইয়ের পাতাতেই লোহার বাসর বসিয়েছে। কেউ তারা নেই। আর কোনদিনই তাদের দেখা মিলবে না।

কিন্তু মা মনসা হয়তো এই মনসাপোতাতে ঢিবির মধ্যে সবার অলক্ষ্যে বসে বছর বছর সবার পুজো নিচ্ছেন।

আজকের মনসাপোতায় এসে দাঁড়ালে মন আপনার বিষাদে ভরে যাবে—কেন জানেন!

আজও আমাদের ঘরে ঘরে বেহুলার মত কত নারী আছেন, কিন্তু স্বামীকে যে কতটুকু ভক্তি করেন বোলতে পারেন।

কিন্তু বেহুলা লখিন্দরের গলিত শবদেহ নিয়ে যে নদীতে ভেসেছিল সে জল শুধু নদীর জলই ছিল না, তার সাথে ছিল বেহুলার চোখের জল। সেই চোখের জলের নদীতে আজও স্নান করবার সময় আমাদের দেশের মা-বোনেরা হয়তো কান পাতলে শুনতে পাবেন—

"ভাসিয়া নয়ন জলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে
প্রভু জাগিয়া উত্তর দেহ মোরে।
আমিত অভাগিনী, ভাল-মন্দ নাহি জানি
তোমা লইয়া ভাসিলাম সাগরে।"

কিন্তু এদের চোখ কি জলসিক্ত হয় সেই কথা ভেবে।

—হয় না।

মনসাপোতায় এসে শুধু পুজো দিয়ে মেলা দেখে প্রণাম কোরে ফিরে গেলে চলবে না।

প্রার্থনা কোরতে হবে মা মনসার কাছে—মাগো, আমার ঘরের বেহুলা হারিয়ে গেছে কোন অজানায়—তাঁকে খুঁজে বের করে দাও।

শলাকীর মা মনসার মেলা

একশো বছর আগের কথা।

শলাকীর বিরাট বিলে শুধু পদ্মফুলের বন ছিল।

রাত পোহালে সারা বিল লালে লাল হোয়ে যেতো। কত রং-বেরঙের পাখী এসে বসতো সেই বিলে। লোকে বলত পদ্মবিল।

সে বিলে সাপের ভয়ে কেউ নামতে পারতো না। নানান রকম সাপ ঘুরে বেড়াতো পদ্ম পাতার ওপর দিয়ে। জাত সাপের কামড়ে কত লোকের যে জীবন শেষ হয়েছে তার কোন হিসাব নেই। বিলের পাশ দিয়ে যে সব জমি ছিল তাও শলাকীর মানুষ চাষ করতেও পারতো না সাপের ভয়ে। সারা জমিতে শুধু গর্ত। বড় ছোট মাঝারি সব রকমের সাপ প্রায় সব সময় ঘুরে বেড়াতো। কাজেই বছরের পর বছর অনেক জমির আবাদ হত না।

মাঠের মাঝে বড় বড় ঢিপি আর গর্ত—এই মাটিতে লাঙলের ফাল বসাবে কে। বছরের পর বছর যদি কেউ জমি চাষ না করতে পারে তাহলে মানুষের দিন চলে কি করে। শলাকী ছেড়ে কত মানুষ যে কতদিকে চলে গেছে তারও কোন হিসাব নেই। শুধু শলাকী নয়, খেদাইতলার অনেক মানুষ চলে গিয়েছিল সেই সময়।

গ্রামের প্রাচীন লোকেরা বলেন—এত সাপের যখন আনাগোনা, তখন নিশ্চয়ই এখানে মা মনসার আস্তানা আছে। এটা মা মনসার রাজ্য, তাই এখানে বিলে কেউ মাছ ধরতে পারে না, জমিতে কেউ চাষ আবাদ করতে পারে না।

তখন কেউ কেউ নাকি মন্তব্য করেছিলেন—শ্রাবণ মাসের শেষে মা মনসার পুজো দিলে তাহলে মা মনসা শান্ত হবেন। এ ছাড়া আর এখানে কারও বাস করবার উপায় নেই।

কোনকালে চাঁদ সদাগর মনসার পুজো দেবেন না বলে মা মনসা তার সপ্ত-ডিঙ্গা ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। সমস্ত ছেলেগুলোকে তিনি রাগে দংশন করে শেষ করেছিলেন। একালে কি মা মনসা শলাকীর মানুষগুলোর ওপর কুপিতা হোয়েছেন?

সেইকাল থেকে আজ অবধি শলাকীর গ্রামে মা মনসার পূজো ও মেলা চলছে। গ্রামের প্রাচীন লোক যাঁরা আছেন, তাঁরা বলেন—শলাকীর একপাশে যে বিরাট নিমগাছ, তারই তলায় হোত এই পূজা। নিমগাছের পাশে দুটো মনসা গাছ ছিল।

মনসা পূজোর দিন আশে-পাশের গ্রামের লোক ভেঙে পড়তো এই শলাকীতে। অনেকখানি জায়গা নিয়ে পূজোর নৈবেদ্য সাজানো হোত। পুরোহিত মন্ত্র পড়তেন আর সাপ এসে নৈবেদ্য খেয়ে যেতো। যতক্ষণ পূজো হোত, গাছের ডালে নানান রকমের সাপ ঝুলতো। পূজা শেষে সাপে মুখ দেওয়া প্রসাদ খাবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যেতো। মা মনসা স্বয়ং এসে নাকি নৈবেদ্য প্রসাদ কোরে দিয়ে যেতেন। এই প্রসাদ খেয়ে কারও কোনদিন কোন ক্ষতি হয়নি।

পূজার দিন সন্ধ্যাবেলায় গ্রামের ছেলেরা মনসার ভাসান গেয়ে গ্রাম মাতাতো—কেউ কেউ বিষহরির পাঁচালী পড়তেন চীৎকার করে।

তারপর ধীরে ধীরে সাপের প্রকোপ কমে যায়।

কোথায় গেলো এত সাপ?

গ্রামের লোক নির্ভয়ে চাষ সুরু করলো জমিতে। মাছ ধরা আর পদ্মফুল তোলা সুরু হয়ে গেলো পদ্মবিলে।

সেই থেকে চলছে শলাকীর মেলা আর মনসা পূজা।

আজ সেই পদ্মবিলের সন্ধান কেউ পাবে না।

বিরাট একটা নিমগাছের তলায় পূজা হয়। গাছের ওপর ডালপালা বেশী নেই—শুধু গাছের গোড়াটা খুব মোটা যা তিন-চার জন মানুষ বেড় দিয়ে ঘিরতে পারে না।

কেউ বলে এ গাছ সেই আগেকার গাছ, আবার কেউ বলে সে গাছ মরে গেছে। তারপর নাকি নতুন গাছ লাগানো হোয়েছিল। কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা তা কে জানে।

যে মানে সে মানে—

কিছু সত্য আছে বৈকি, নইলে প্রতি বছর এত মানুষ আসে কেন?

রাণাঘাট শিয়ালদহ লাইনে চাকদহ ষ্টেশনে নেমে বাসে উঠে বেলে-বিষ্ণুপুর নামতে হবে শলাকী যেতে হলে। চাকদহ থেকে কতই বা দূর হবে। খুব বেশী হোলে ছয় মাইল। বিষ্ণুপুরের অনেক আগে থেকেই মেলা বসে রাস্তার

পাশ দিয়ে। আম, নারকেল, লিচু, সুপারীর চারা নিয়ে বসে যায় বিক্রেতারা। গাছ-গাছড়ার চারা বোধ হয় আর কোন মেলাতে এত কেনা-বেচা হয় না। এই সব ছেড়ে একটু দূরে বিক্রী হচ্ছে লাঙলের ঈশ, কোদাল প্রভৃতি।

এইবার দক্ষিণ দিকে গ্রামের ভিতর ঢুকতে হবে। শলাকী যেতে হলে সরু পথটা ধরতে হবে, দু-পাশে মাঠে চাষ হচ্ছে। কোন মাঠে পাটের গাছ দেড় মানুষ সমান উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে মানুষের আনাগোনা।

এদিন মানুষ যাওয়া-আসার বিরাম নেই। আরও কিছুদূর গিয়ে বিরাট মাঠ। এই সময় প্রতি বছরই মাঠটা বৃষ্টির জলে ডুবে যায়। কোনখানে হাটুজল আবার কোনখানে একটু বেশী। ঐ মাঠটার ওপর দিয়ে হাঁটুজল ভেঙ্গে পার হতে পারলেই পুজোর জায়গায় গিয়ে পৌঁছানো যায়।

ওখানে জলকাদার মধ্যেই সারি সারি বসেছে চিনি-বাতাসা মর্তমান কলা ও ফুল বেলপাতার দোকান। পুজোর ভোগ এখান থেকেই কিনতে হয়।

পুজোর জায়গা লোকে লোকারণ্য। নিমগাছের গোড়াটা সিঁদুরে সিঁদুরে লাল হয়ে গেছে। পুরোহিত আছেন চার পাঁচজন, তাঁরাই সবার হাত থেকে ভোগ নিয়ে নিবেদন করে দিচ্ছেন মা মনসার চরণে।

পুজো দিতে এসে যদি পুরানো দিনের কথা মনে পড়ে যায়, তাহলে শরীরটা হয়তো একটু শিউরে উঠবে। কিন্তু এখনকার মানুষের আর সে ভয় নেই। নির্ভয়ে তারা জল ভেঙ্গে এসে পুজো দিয়ে যায়।

ভক্তি যার আছে, তার আবার ভয় কিসের? বিশ্বাস যার আছে তার সব আছে। ভক্তিতেই তো সব কিছু।

শলাকীর মা মনসা তাই আজ জাগ্রতা দেবী।

মানুষের শ্রদ্ধা ভক্তিতে তিনি আজ সবার জননী।

বিরহীর মদনগোপালের ভাইফোঁটার মেলা

শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলেছিলেন—

"দেশে দেশে কলত্রাণী
দেশে দেশে চ বান্ধবা।
তস্মাৎ দেশাং ন পশ্যতি
যত্র ভ্রাতা সহোদরা॥

কিন্তু আজ সব ওলট পালট হয়ে গেছে। সহোদরা ভাই সবার আছে: কিন্তু সে ভাই আজ কোথায়? কোথায় তারা সব হারিয়ে গেল? আজ ভাই পথে বসাচ্ছে আর এক ভাইকে। বোন কাঁদছে ভাইয়ের বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে। সত্যিকার আপন ভাইকে ফোঁটা দিতে গেলে বিরহীতে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন।

বিরহী।

কি অপরূপ নাম!

ঝাউডাঙ্গা, লাউহাটি, স্বর্ণপুর, ঘেটুগাছি এসব নাম তো হতে পারত! কিন্তু নাম হল বিরহী।

গ্রামের নাম।

এমন মধুক্ষরা, অমৃতঝরা নাম যে কে রাখল গ্রামের, কেন হল এমন নাম! সোনাই এর মত কেউ কি কারও বিরহে আত্মাহুতি দিয়েছিল কোন নদীতে বা পুকুরে।

না তা নয়!

তবে কি? কারও বিরহের জন্য এই নাম!

সে কোন বিরহী যার স্মৃতি চিরজাগ্রত রাখতে এই নাম।

হ্যাঁ—মনে পড়ে আর এক বিরহীর কথা, যিনি সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চার যুগে বিরহলীলা করেছিলেন। সত্যযুগে লক্ষ্মীনারায়ণ, ত্রেতা যুগে রামসীতা, দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণরাধা আর কলিতে নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়া। চারযুগেই একই তিনি বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন মূর্তিতে বিরহলীলা করেছেন।

এই বিরহী কি তবে সেই বিরহীর লীলাক্ষেত্র?

ঠিক তাই।

এবার চলুন সেই বিরহীর লীলাক্ষেত্রে। কোনদিক থেকে আসবেন? কলকাতা না বহরমপুর, ডায়মণ্ডহারবার না উলুবেড়িয়া, যেখান থেকেই আসুন রাণাঘাট কলকাতা লাইনে মদনপুর ষ্টেশনে নামুন। ষ্টেশন থেকে পূর্বদিকে এগিয়ে গিয়ে পীচের রাস্তা ধরে জাতীয় সড়কে গিয়ে বাস ধরে মাইল দুই গিয়ে বিরহীতে নেমে পড়ুন। বাসে দুদিক থেকেই আসা যায় বিরহী গ্রামে!

আজকের বিরহী বেশ জনাকীর্ণ গ্রাম। হাট, বাজার, স্কুল, পোষ্টাফিস সবই আছে। আর আছে একটা সরকারী চেকপোষ্ট। এখানে সব লরী গাড়ী অন্যান্য যানবাহন চেক্ করা হয়। চেকপোষ্ট ছাড়িয়ে আর একটু গিয়ে মদনগোপালের মন্দির।

এখানে এসে দাঁড়ালে মনটা যেন কেমন হয়ে যায়। মনে হয় কোন এক অদৃশ্য প্রহরী এখানে এই চেকপোষ্টে সবাইকে অবিরাম পরীক্ষা করে চলেছেন। নিষিদ্ধ জিনিষ পরীক্ষা করে তবে যাবার ছাড়পত্র দিচ্ছেন।

কারা ছাড়পত্র পাচ্ছেন?

যাঁরা চলেছেন অন্তরে শ্রদ্ধা ভক্তি নিয়ে।

যাঁরা চলেছেন শুদ্ধ প্রেমের পুটলি হাতে নিয়ে।

আর নিষিদ্ধ জিনিষ কি?

তা হচ্ছে হিংসা, দ্বেষ, কপট ভক্তি আর অবিশ্বাস।

এসব নিয়ে তো মদনগোপালের কাছে যাওয়া যাবে না।

এই বিগ্রহ যে কতদিন আগেকার তা সঠিক না বোলতে পারলেও এটা জানা যায় যে প্রায় পাঁচশো বছর আগে এক অজ্ঞাত অখ্যাত বৈষ্ণব এক বটতলায় বসে মদনগোপালের উপাসনা কোরতেন। সবসময় তিনি নাম-গানে বিভোর থাকতেন। তাঁর ধ্যান-ধারণা পূজার্চনা সবই ঐ মদনগোপালকে ঘিরে। মন্দির নেই; নেই কোন আলোর ছায়া, নেই কোন পুজার উপকরণ, অথচ ঐ বৈষ্ণব একমনে মদনগোপালের উপাসনা কোরে চলেছেন অন্তরের ভক্তি দিয়ে। কারও কাছে কোন অভিযোগ নেই, আবেদন-নিবেদন নেই। তিনি পরমানন্দে পরম আনন্দময়ের সেবা কোরে চলেছেন।

তারপর একদিন—

নদীয়ারাজ সবকিছু শুনে মদনগোপাল বিগ্রহের একটা মন্দির তৈরী কোরে

দেন। পরম ভাগবত নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এমনি ধারা মন্দির আরও অনেক তৈরী কোরে দিয়েছেন। শিব-নিবাসের মন্দির, আড়ংঘাটার যুগলকিশোর মন্দির আরও অনেক মন্দির তৈরী কোরেছেন।

মদনগোপাল বিগ্রহের মন্দির হোল। বিগ্রহ নিয়ে গেলেন বটতলা থেকে মন্দিরে। ঐ বৈষ্ণব নিত্য পুজা করেন। প্রতি সন্ধ্যায় নামগানে মুখর হয় মন্দির-প্রাঙ্গন। কত ভক্তজন আসেন।

কিন্তু সবকিছু হোলেও কিসের যেন অভাব, কি যেন নেই, কি হোলে যেন ভাল হোত। কে বোলবে সে কথা, কে জানে সে কথা।

মদন গোপাল একাই ভক্তজনের পূজা গ্রহণ করেন।

পূজাশেষে মন্দিরের দোর বন্ধ হয়ে যায়।

মদনগোপাল একাই থাকেন :

বৈষ্ণব ভাবেন, প্রভুর পূজার্চ্চনা তো সাধ্যমত চলছে। কোন ত্রুটি তো নেই, তবে কেন মদন গোপালের বিষণ্ণ বদন? ধড়াচূড়া সবই আছে কিন্তু মুখের হাসি কোথায় গেলো? মদনগোপালের সুখ নেই!

মদনগোপালেরও সুখ নেই!

যিনি সারা দুনিয়ার পশুপক্ষী, জীবজন্তু, বৃক্ষলতা গুল্ম প্রত্যেকেরই সুখ-দুঃখের নিয়ন্তা, তাঁর কেন বিষণ্ণবদন? কার বিরহে তিনি আকুলি-বিকুলি কোরছেন, কার প্রেম-সুরধনীতে অবগাহন কোরবার জন্য মদনগোপালের ঘুম নেই?

তিনি স্বপ্নাদেশ কোরলেন—

পরে খোঁজ পাওয়া গেলো তাঁকে!

কে তিনি!

শ্রীরাধিকা।

যমুনার ধারে শ্রীরাধার একটা মূর্ত্তি পাওয়া গেলো।

সেই মূর্ত্তিটা এনে মদনগোপালের সংগে যুক্ত কোরে দেওয়া হোল।

বিরহের অবসান হোল।

একজনের চোখে ছিল না ঘুম, আর একজন যমুনার ধারে চোখের জলে বুক ভাসিয়েছেন আর বোলেছেন—

"এক জ্বালা হইল ঘর আর জ্বালা কানু,
জ্বালায় জ্বলিল দেহ সারা হইল তনু।"

তখন গ্রামের নীচে বন বনালীর গা ছুঁয়ে যমুনা বয়ে যেতো। বাঁধানো ঘাট থেকে সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরে উঠতে হোত।

এখন আর সে যমুনা নেই, ঘাট নেই, সব মজে হেজে গিয়েছে। রাধাকৃষ্ণের এই বিরহের কথা নিয়েই গ্রামের নাম হোল "বিরহী"

বাংলাদেশে ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার উৎসব ও মেলা আর কোথাও হয় না। কোন পাঁজি পুঁথিতেও এ মেলার কথা লেখা নেই। প্রতি বছর ভাইফোঁটার দিনে যে সব বোনেদের ভাই নেই, তারা এসে মদন-গোপালের কপালে ফোঁটা দেয়, অবশ্য যাদের ভাই আছে, তারাও এসে ফোঁটা দেয়। অব্রাহ্মণ মহিলা বা বোনেরা তেল হলুদ সিঁদুর মেশানো ফোঁটা দেন মন্দিরের দুপাশের দেওয়ালে, উৎসবের দিন মন্দিরের দেওয়াল আর খালি থাকে না।

পরম করুণাময় ভগবান মদনগোপালকে ভ্রাতৃভাবে আরাধনা সারাদেশে এই বিরহীতেই দেখা যায়। ভাই, বন্ধু, মাতাপিতা সবই তো তিনি। এমন আপনজন আর কে কোথায় পাবে? তিনি সর্ববিরাজমান, শুধু তাঁকে খুঁজে নিতে হবে।

লালন ফকির কেঁদেছিলেন—

"আমি একদিনও না দেখিলাম তারে
আমার বাড়ীর কাছে আরশীনগর
সেথায় এক পড়শী বাস করে॥"

বিরহীর ভাইফোঁটার মেলা বহুকাল ধরে চলে আসছে। তবে অনেকেই হয়তো জানেন না যে বাড়ীর কাছে,আমাদের এমন এক পড়শী আছে, যাঁকে ঘিরে এতবড় একটা উৎসব হয়।

মেলা বসে মন্দিরের আশপাশ ঘিরে। কত রং-বেরঙী জিনিসে ভরে যায় মেলার জায়গা। গাছপালা থেকে সুরু করে পাথরের বাসন, কাঠের জিনিষ সব কিছুই আসে। মিষ্টির দোকানও অনেক বসে। ভাইফোঁটার দিনটি বিরহী গ্রাম বেশ উৎসব-চঞ্চল হয়। অনেক দিকের অনেক মানুষই মেলা দেখতে আসেন, পূজাও দেন। কৃষ্ণনগরের বারদোলের মেলার সময় বিহারীর মদন-গোপালকেও যেতে হয়। বার জায়গার বারটি বিগ্রহ সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে—

"বিরহীর বলরাম, শ্রীগোপীমোহন।
লক্ষ্মীকান্ত বহিরগাছি গুরুর ভবন॥

নারায়নচন্দ্র ছোট ব্রহ্মণ্যদেব সহ।
আর বড় নারায়ন রাজার বিগ্রহ।
গড়ে গোপাল পেয়ে স্থান শান্তিপুর।
অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ স্থানে ঘোষঠাকুর॥
নদীয়ার গোপাল তরে নবদ্বীপ স্থান।
ত্রিহট্টের কৃষ্ণরায় অগ্রবাল গান॥
অতঃপর কৃষ্ণচন্দ্র, গোবিন্দদেব আর।
উভয় বিগ্রহ স্থান—আবাস রাজার॥
মদনগোপাল শেষে বিরহীতে স্থিতি।
বারদোলে তের দেব আবির্ভূত ইতি॥
হেরিলে দেবেরে হরে আধি, ব্যাধি, ক্লেশ।
রাজবেশ, ফুলবেশ, রাখালের বেশ॥
ভক্তিভরে দেব নাম করিলে কীর্ত্তন।
সকল পাতক নাশে শান্তি লভে মন॥"

———

চাকদহের শ্রীশ্রীগণেশ জননী মেলা

নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র স্বপ্ন দেখলেন জগৎ জননী যেন তাঁকে বলছেন : —গণেশ জননীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে সেখানে নিত্যপূজার ব্যবস্থা করতে হবে।

কৃষ্ণচন্দ্রের ঘুম ছুটে গেল।

এমন কৃপা কার ওপর হয়? জগৎজননী তাঁকে স্বপ্নাদেশ করছেন।

এ আদেশ পালিত হল বাংলা ১০৬৫ সালে।

চাকদহের কাছে আনন্দগঞ্জে গণেশ জননীর মন্দির প্রতিষ্ঠা হল। প্রতি মাঘী পূর্ণিমায় ধুমধাম করে প্রচার হল পূজার।

আশপাশের আট-দশটা গ্রামের মানুষ এসে জমতে লাগল। মেলাও বসল।

মানুষের মেলা। কত জায়গার মানুষ এসে মিলল আনন্দগঞ্জে। পূজা দিয়ে মেলায় ঘুরে, এটা ওটা কিনে ঘরে ফিরলো।

আজও প্রতি মাঘী-পূর্ণিমায় পূজা হয়, চারদিন আর মেলাও বসে; তবে মেলার সে জৌলুষ আর নেই। পূজার্চ্চনা হয় কোন রকমে।

ছোট ছোট কয়েকটা দোকান পশরা সাজিয়ে বসে। দু'চারটে মিষ্টির দোকানও। কিছু লোহার হাতা খুন্তীর দোকানও আসে।

মানুষের সেই মেলা আজ আর নেই। যারা আসেন, তাদের যেন এক নজরেই গুণে ফেলা যায়। মায়ের মুখখানার দিকে তাকালে মনে ব্যথাই লাগে।

জগৎ-জননী, জীবপালিনী যিনি, তাঁর মুখে হাসি নেই। মায়ের এ কী রূপ! এ রূপ তো আমার মায়ের নয়।

যিনি একদিন এখানে গঙ্গার ঘাটে কান্তাসুর নামক দৈত্যকে বধ করেছিলেন, তিনি আজ মাটির ঢিবি হয়ে সকলের করুণা ভিক্ষা করছেন। যাঁরা আসেন, তাঁরা দু'চারটে পয়সা ফেলে দিয়ে একটা প্রণাম করে চলে যাচ্ছেন। জগৎ-জোড়া যাঁর সন্তান-সন্ততি, তিনি আজ ভিখারিণী।

মানুষ আজও তবু আসে প্রতি মাঘী-পূর্ণিমায় গণেশ-জননীর পাদমূলে পূজো দিয়ে আশীর্বাদ চেয়ে নিয়ে যায়।

ভক্তির উৎস মানুষের আজও শুকিয়ে যায়নি। ভক্তি ছাড়া মুক্তির পথ নেই। দেশে যতই আকাল হোক, দেশের পরিস্থিতি যতই ভয়াবহ হোক, দেব-দ্বিজে মানুষের ভক্তি ঠিকই থাকবে।

ভক্তির আকাল এদেশে কোনদিন হয়নি, আজও হবে না।

ইষ্টার্ন রেলওয়ের চাকদহ ষ্টেশনে নেমে সোজা পীচের রাস্তা ধরে চলে যেতে হবে আনন্দগঞ্জে। বাঁদিকে গণেশ-জননীর মন্দির। নাই বা থাকলো মেলার জৌলুষ, নাই বা থাকলো আলোর রোশনাই—মা তো আছেন। মাকে দর্শন করতেই তো আসা! মাকে দর্শন করলেই তো সর্বদর্শন!

চাকদহ আজ নতুন রূপ ধারণ করেছে। কত মানুষ, স্কুল, কলেজ, সিনেমা। কিন্তু অতীতের পতিত জমি জরিপ করলে দেখতে পাই চাকদহের পূর্বনাম ছিল চক্রদ্বীপ বা চক্রদহ। কিংবদন্তী যে ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের সময় রথের চাকা এখানে গভীর গর্ত কেটে গিয়েছিল। গঙ্গাজলে সে গর্ত ভরে গিয়ে নাম হোল চাকদহ।

এ জায়গার মাহাত্ম্য পুরাণ-পুঁথিতে আজও লেখা আছে, এ স্থান অতি পবিত্র। গনেশ-জননীর মন্দির যখন প্রতিষ্ঠা হ'ল, তখন এদেশে রেলপথ ছিল না। সে সময় খুলনা বরিশাল যশোহর থেকে বহুলোক গঙ্গাস্নান করতে আসত। আজও অনেক দূর থেকে মানুষ শবদাহ করতে আসে চাকদহের গঙ্গার ঘাটে।

এখানকার গঙ্গায় আগে মানুষ নাকি শিশুসন্তান বিসর্জন দিত পুণ্য লাভের আশায়।

রাজা মানসিংহ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে যখন মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে দমন করবার জন্য বাংলায় আসেন, তখন প্রবল ঝড়-বৃষ্টির জন্য এখানে অপেক্ষা করেছিলেন।

এখানে কাঁঠালপুলিতে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম মহেশ পণ্ডিতের বেদী ও পাট আছে। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে মহেশ পণ্ডিতের তিরোভাব উপলক্ষে বিরাট উৎসব হয়।

চাকদহের কাছে পালপাড়ায় হিন্দু আমলের নির্মিত একটা প্রাচীন শিবমন্দির আছে—আজও চলন্ত ট্রেনে বসেই সে মন্দির দেখা যায়। এই মন্দিরের কারুকার্য দেখবার মত। ছোট ছোট লাল ইট দিয়ে নির্মিত এই মন্দির। কিন্তু আর কত দিন যে এ মন্দির থাকবে, তা বলা যায় না। কেন

না, বার্দ্ধক্যের চাপে ইটগুলো সব গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে ভেঙে পড়ছে। এ মন্দির খুব সম্ভব ৫০০ বছরের আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। "কুলার্ণবতন্ত্র" প্রণেতা তান্ত্রিক পণ্ডিত নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার এই গ্রামেরই মানুষ ছিলেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড বিশপ হিবর তাঁর ডায়রীতে এই পণ্ডিতের শুধু নামই উল্লেখ করেন নি, ভূয়সী প্রশংসাও করেছেন।

কালের রথচক্রের বিরামহীন গতিতে কত সৃষ্টি ও সভ্যতার অপমৃত্যু ঘটছে, আবার কত জনপদ, কত নতুন সভ্যতার নবজন্ম হচ্ছে; কিন্তু যা ভেঙে পড়ছে, তা আর সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছে না। এই পালপাড়ার মন্দির, আনন্দগঞ্জের গণেশ জননী মন্দির আজ হোক কাল হোক হয়তো মাটির সংগে মিশে যাবে, তারপর হয়তো কোন দানবীর বা অর্থশালী মানুষ এই মন্দিরের চিতাভস্মের ওপর নতুন মন্দির গড়বেন। কিন্তু যা হারিয়ে যাবে, তা কি আর পাওয়া যাবে?

যাবে না কোনদিন।

জগন্মাতা গণেশ-জননী! সকলের অবহেলায় তোমার ঘর যদি একদিন মাটিতে মিশে যায়, তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু মা গো, তুমি যেন আমাদের ঘর ছাড়া ক'রো না! আমাদের মনোমন্দিরে তোমার আসন যেন চিরস্থায়ী হয়।

নদীয়ার নোকাড়ীর জহুরামাতার পূজা ও মেলা

দিনটা ছিল বুদ্ধপূর্ণিমা।

ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব তিথি।

বসে বসে ভাবছিলাম সেই করুণাঘন ভগবানের কথা।

মাঝে মাঝে শঙ্খধ্বনি ভেসে আসছে। আজকের দিনে অনেক বাড়ীতে সত্যনারায়ণের পূজো হচ্ছে।

কি অপূর্ব দিন! আজ ভগবান নেমে এসেছিলেন মাটির পৃথিবীতে।

ছেলেটা এসে হঠাৎ বললে যে, বাবা মেলায় যাবো।

:—মেলা! মেলা কোথায় রে!

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল জহুরা মাতার কথা। হ্যাঁ, আজই তো নোকাড়ীতে পূজো হচ্ছে, মেলাও বসেছে।

মনে যখন পড়েছে, তখন কি আর ঘরে বসে থাকা যায়!

যেতে হ'বে।

রাণাঘাট রেল ষ্টেশন পার হয়ে ওপারে রথতলা, সেখান থেকে রিক্সা চেপে বসলাম। এখান থেকে তু'মাইল পথ যেতে হ'বে, তবেই নোকাড়ী গ্রাম মিলবে।

বেলা পড়ে এসেছে। সূর্য্যের শেষ আলোটুকু যায় যায়।

হ্যাঁ, বেলা গেল।

তোমার আমার সকলের জীবনের মালঞ্চ থেকে একটা বেলা ঝরে গেল ফুলের মত। সারাদিন তো হেলা ফেলায় কেটে গেল। দিলামও না কিছু, পেলামও না কিছু।

ভক্ত প্রহ্লাদ খেলার সাথীদের বলেছিলেন সেই ছোট বয়সেই :—ওরে খেলা করে সময় কাটালে ভগবানকে ডাকবি কখন—সময় যে চলে যায়। এবার খেলা ফেলে ভগবানকে ডাক।

সত্যিই সময় যে চলে যায়।

কতক্ষণ কেটে গেছে কে জানে।

হঠাৎ কানে ভেসে এলো—

"ডাক দেখি মন ডাকার মত
কেমন শ্যামা থাকতে পারে।"

:—বাবু নামুন আমরা এসে গেছি !

রিক্সাওয়ালা রিক্সা থামিয়ে দিল।

এসে গেছি মায়ের চরণ প্রান্তে—

রাস্তার দু'ধার দিয়ে দোকানের সারি বসেছে।

বাদাম ভাজা, আঙ্গুলে গজা, পাঁপর ভাজার দোকানই বেশী। একপাশে খেলনার দোকানও বসেছে। এসেছে হাতা খুন্তীর দোকান, এসেছে বেলুন ওয়ালা।

ভীড় ঠেলে এগিয়ে চলেছি মন্দিরের দিকে—

ধূপধূনোতে ঘর অন্ধকার। অপরূপ গন্ধে চারিদিক আমোদিত। শঙ্খঘণ্টা আর কাঁসরধ্বনিতে সারা মন্দির প্রাঙ্গন জমজমাট।

মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

প্রণাম করে চেয়ে দেখলাম জহুরা মাতাকে।

এই আমার জহুরা মা !

সামনে একটা উঁচু ঢিবির মত। ওটাই নাকি মায়ের দেহ।

একপাশ দিয়ে একটা লম্বা শিকের মাথায় মায়ের মুখ বসানো।

একি অপরূপ রূপ !

একদৃষ্টে দাঁড়িয়ে দেখছি।

মা যেন বলছেন, ভয় কি রে, এই তো আমি !

না ভয়ের কিছু নেই—মায়ের কি আমার রূপের অভাব আছে ! একই অংগে কত যে রূপ, তা কে জানে।

মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা যুগোলকিশোর নন্দী।

২৩।২৪ বছরের এক সৌম্য যুবক। চোখে মুখে তার ভক্তির প্রলেপ যেন মাখানো।

আমার সামনে এসে বললে: দাদা এসেছেন, যাবার আগে মায়ের প্রসাদ নিয়ে যাবেন।

:—হ্যাঁ যাবো ভাই। আমি মায়ের সামনে একটু বসি।

জহুরা মাতার এখানে কিভাবে আবির্ভাব হ'ল, তা না বললে সব কিছুই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

মালদহ জহুরাতলার সর্বজনবিদিত জহুরা মাতা চিরজাগ্রতা। মালদহের যে কোন মানুষ এই মায়ের নামে মাথা নীচু করে প্রণাম জানায়। ছয় বছর হল এই মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। যুগোলকিশোরের বয়স তখন ১৬।১৭—অত্যন্ত দুরন্ত ছেলে। সংসারের অবস্থাও স্বচ্ছল নয়। বাবা শাকসব্জী বিক্রি করে কোনমতে দিন কাটান। চঞ্চল যুগলকিশোরের সংসারের কথা ভাববার সময় নেই; দিনরাত সে আপন খেয়ালেই ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে বাপের বকুনি খায়। মনের দুঃখে কখনও তিন চার দিন পালিয়ে বেড়ায়, আবার ফিরে আসে।

তারপর একদিন।

যুগলকিশোর এক গাছতলায় ঘুমন্ত অবস্থায় এক স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হয়। জহুরা মাতা স্বপ্নে তাকে আদেশ দেন নোকাড়ীতে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করে পূজো করতে হবে।

ঘুম ভেঙে উঠে যুগলকিশোর যেন সম্পূর্ণ বদলে যায়।

কোথায় গেল তার চঞ্চলতা—এ যেন আর এক যুগলকিশোর।

মায়ের কৃপাবলে দেখতে দেখতে ঐ বালক ধীরে ধীরে মন্দির প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করল। যুগলকিশোর মহানন্দে এই কাজে লেগে যায়। মা আসছেন ছেলের কাছে কৃপা বরিষণ করতে। কার না আনন্দ হয়?

:—দাদা!

হঠাৎ চমকে উঠলাম।—ডাকলাম যুগলকিশোরকে কাছে।

শুধু বললাম, তারপর কি হল? কিছু বলবে না? আমি যে আরও জানতে চাই।

:—কি জানতে চান?

:—কি পেলে তুমি?

:—কি পেলাম! সবই পেলাম। মায়ের কৃপায় আজ আমায় কোন অভাব নেই। ঐ দেখুন পাকাবাড়ী, চারপাশে এসব জমি। মা আমাকে করে দিয়েছেন। এই যে মন্দির, এও মা করেছেন। নইলে এসব করি আমার কি ক্ষমতা আছে?

:—এ ছাড়াও আর কিছু—

:—না দাদা আর কিছু বলতে পারবো না। তাহলে ......

:—কি ভাই!

:—তাহলে আমার মস্ত ক্ষতি হয়ে যাবে।

যুগলকিশোরের চোখের কোনটা মনে হল জল জমে এসেছে। একি! যুগলকিশোর কাঁদছে নাকি?

:—থাক ভাই, আর বলতে হবে না।

যুগলকিশোর চোখটা মুছে বললে: শুধু জেনে রাখুন, মা আমার জাগ্রতা। যার যা কামনা বাসনা মা তা অবশ্যই পূর্ণ করেন। কত মেয়ের বিয়ে হয় না, তারা এসে মায়ের কাছে মানত করে পেয়েছে স্বামী। কত মায়ের ছেলেমেয়ে হয় না, তারা এখানে এসে মায়ের কাছে পুজো দিয়ে গেছে তারাই আবার পরের বছর ছেলেমেয়ে কোলে করে এসে ভক্তিভরে পুজো দিয়ে গেছে। এমন ঘটনা শুধু একটা নয়, অনেক ঘটেছে। দাদা, শুধু বিশ্বাস—যে বিশ্বাস করে, সে অবশ্যই পায়।

একটা ছেলে কলাপাতায় মোড়ানো প্রসাদ নিয়ে এসে হাতে দিল।

মন্দিরের ভিতর দেখলাম ফলমূল ঢিবি হয়ে আছে। মন্দির প্রাঙ্গনে একটা কাঁঠাল গাছ, তাতে অজস্র ঢিল বাঁধা আছে। যার যা কামনা মাকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই ঐ ব্যবস্থা।

শুধু ভাবি, যাঁকে বাঁধলে আর কিছু বাঁধবার দরকার নেই, তাঁকে বাঁধার সাধনা করতে পারলে সবাই বেঁচে যেত।

পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে নোকাড়ীর আকাশে।

মানুষ গিজগিজ করছে মেলাতে—মন্দিরে প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম।

আবার রিক্সায় উঠলাম।

ছেলে বলে উঠল: মেলায় যাবো।

:—এই তো মেলা দেখে এলি।

:—অন্য কোথাও চলো।

:—যাবো, সামনের মাসে নবাবগঞ্জের ঝুলন মেলা দেখতে।

রিক্সা চলছে।

আবার বুঝি সেই লোকটা গান ধরেছে—

"মা কি আমার কালো রে
কখনও শ্বেত, কখনও পীত
কখনও নীল লোহিত রে"।

পাটুলির বড়পীরের মেলা

সোনার বাংলাদেশ।

যুগে যুগে কত মহাপুরুষ মনীষী এসেছেন এই দেশে। এসেছেন ধর্ম-প্রবর্তক, কবি, শিল্পী, সাধু, যোগী, পীর-পয়গম্বর, ফকির। আমাদের দেশে কৃষ্টির, সাংস্কৃতির, ধর্মের, সাহিত্যের কাব্যের ধারক ছিলেন তাঁরা। তাঁদের মধ্যে এক একজন এমন সব অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়ে গেছেন, যা আজকের ইতিহাসের পাতায় তা আজগুবি বলেই মনে হয়। তবুও মানুষ ভুলতে পারেনি তাঁদের সাধনার দান, ভুলতে পারেনি তাঁদের মহত্বকে। বিশ্বাস আর অবিশ্বাস এই দুই সুতোর দোটানায় আজও মানুষ তাঁদের কথাই প্রচার করছে নানান্ ভাবে। আজ যদি বলি, জানেন আপনি এক বড়পীরের কথা, যাঁর গোরস্থানে এই দেশের মানুষ প্রত্যেক বছর মাঘী পূর্ণিমায় পূজো দিচ্ছে, আর সেই পীরস্থানকে ঘিরে বসেছে এক বিরাট মেলা। আপনি হয়তো অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকবেন।

কোলকাতা থেকে ৪০ মাইল দূরে পায়রাডাঙ্গা রেলওয়ে ষ্টেশন। ভূগোলের পাতায় এটা নদীয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমায় পড়ে। ষ্টেশন থেকে সোজা পীচের রাস্তা ধরে চলে যেতে হবে মাইল দেড়েক। এখানেই থামতে হবে—এটা পাটুলি গ্রাম। আজও এদেশের মানুষ এ মেলাকে বলে থাকে "পাটুলির এলা"। একদিন পাটুলীতে মানুষের চাইতে জংগলই বেশী ছিল। দেশ ভাগ হবার পর ওপার বাংলা থেকে এপারে বহু লোক এসে বসবাস করছে।

বড়পীরের গোরস্থান গভীর নিস্তব্ধতায় ভরা। আগে চারপাশে ছিল শুধু বন আর বন। দূর থেকে দেখলে মনে হ'ত কে যেন অনন্তকাল ধরে এই বনানীর মাঝে সাধনায় ডুবে আছে। কথিত আছে যে এই পীরস্থানে যদি কেউ অশৌচ অবস্থায় আসতো, তাহ'লে সংগে সংগে তার মাথা নাকি ধড় থেকে নেমে যেত। এমনিধারা ঘটনা প্রত্যক্ষ করে তদানীন্তন শিষ্য পীরকে একদিন বলেছিলেন যে, এইভাবে যদি নিত্য নতুন ঘটনা ঘটে, তাহলে কেউ আর পীরের কাছে অসবে না বা পূজো দেবে না। পীর সাহেব জবাব দিয়েছিলেন যে, মাথা আর নামবে না, তবে পায়ের মাংস খানিকটা খসে যাবে।

এসব কথা সত্যি কিনা, জানি না ; তবে এমনি ধারা কথা গ্রামের প্রাচীনদের থেকে ও বর্তমান শিষ্য রহিম বক্সের মুখেই শোনা।

পীরের দেওয়া ওষুধে যে হাজার হাজার মানুষের কঠিন ব্যাধি নিরাময় হয়েছে, তার প্রমাণ আজও পাওয়া যায়। কত খোঁড়া মানুষ পীরের ওষুধ ও কবচ নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেছে ভালোভাবে। এমনি ধারা ঘটনা কয়েক বছর আগে এই মেলায় ঘটে গেছে। মেলা বসবার কয়েকদিন আগে এক উদ্বাস্তু ভদ্রলোকের বৃদ্ধা মায়ের চোয়ালের একখানা হাড় ভেঙে গিয়েছিল বৃদ্ধা যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন। কোলকাতায় নিয়ে যাওয়াই ঠিক হয়। কিন্তু বৃদ্ধা চুপি চুপি পীরস্থানে এসে নাকি কান্নাকাটি করতে থাকেন ও ধূলো মাখতে থাকেন। সেই ধূলো মাখা অবস্থায় তিনি ছটফট করতে করতে বাড়ী আসেন। পরদিন আশ্চর্যজনক ভাবে তাঁর সমস্ত ব্যথার উপশম হয়। এসব কথা বৃদ্ধা নিজ মুখেই বলেছিলেন।

পীরস্থানে এক বিরাট নিমগাছ আছে আজও। গাছের ডালে দড়ি দিয়ে সারি সারি ঢিল বাঁধা আছে। নিমগাছের সামনেই মস্ত এক পুকুর। পুজোর দিনে এই পুকুর নাকি দুধে সাদা হ'য়ে যেত। আজও লোকে এই পুকুরে দুধ ও ডাব দেয়। কিন্তু সেই পুকুরে আজ আর একফোঁটা জলও নেই। পীরস্থান থেকে একটু দূরে সারি সারি শিষ্যদের কবর তার মাঝে এক গোয়ালিনীর কবরও আছে। এই গোয়ালিনীর কঠিন ব্যাধি হওয়ায় পীরের শরণাপন্ন হয়। পীরের আশীর্বাদে সে সুস্থ হ'য়ে উঠে এবং পরে ধর্ম পরিবর্তন ক'রে পীরসাহেবকে ধর্ম পিতা বলে গ্রহণ করে। মৃত্যুর পর অন্য শিষ্যদের মত তাকে কবরস্থ করা হয়। আজও তার কবর আছে। আজও দেশবিদেশ থেকে নানান্ রকম ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ আসে ওষুধ নিতে। বর্তমান শিষ্যই সবাইকে ওষুধ দেন। আজও বহু মানুষ ভালো হচ্ছে এ কথা মিথ্যা নয়। মাঘী পূর্ণিমা ছাড়াও সারাবছরই প্রতি শুক্রবার লোক সমাগম হয় ওষুধ ও কবচের জন্য।

নানান্ রকম জিনিস সাজিয়ে জাঁকজমক ক'রেই মেলা বসে। দেশ-দেশান্তর থেকে আজও হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান গরুর গাড়ি ক'রে এসে এই পাটুলীতেই দু'তিন দিনের জন্য সংসার পাতে। মানত করা মুরগীও আসে শত শত।

আজ পাটুলীর সেই আলখাল্লা পরা সাধক পীরই শুধু নেই, কিন্তু আজও আছে তাঁর গোরস্থান, যেখানে আজও জাতি নির্বিশেষে রোজ সন্ধ্যেবেলায় প্রদিপ জ্বলিয়ে জানায় তাদের কামনা। আজও আছে সেই নিমগাছ ও পুকুর। গোয়া-

লিনীর কবর আর মানুষের মুখে মুখে পীরের মাহাত্ম্যের কথা।

মানুষের সেবায় যিনি নিজেকে এমনভাবে বিলিয়ে দিয়েছিলেন, জন্মান্ধকে যিনি পৃথিবীর আলো দেখিয়েছিলেন, খোঁড়াকে যিনি হাঁটতে শিখিয়েছিলেন, দুস্থ রুগ্ন যাঁর করস্পর্শে নতুন জীবন লাভ ক'রেছিল, যাঁর কৃপায় আজ পাটুলীর মাটি ধন্য তাঁর ছবি কোনদিন দেখিনি। তবে তিনি যে সাধারণ মানুষ ছিলেন না, এটা বেশ বুঝতে পারা যায়। বাংলাদেশের মাটি থেকে এমনিভাবে কত পীর, কত সাধু,, কত ফকির ফুলের মত ঝরে গেছে। ইতিহাস পাঁজী-পুঁথিতে কতক লেখা আছে কতক নেই কিন্তু শেষ হ'য়ে যায়নি তাঁদের সাধনার কথা।

সাধু-সন্ত পীর-পয়গম্বরের দেশ এই ভারতবর্ষে পাটুলীর মত এমনিধারা কত পীরের কথা যে ছড়িয়ে আছে, তা কে জানে!

———

রাণাঘাটের রাধাবল্লভের ঝুলন মেলা

"মিছে ভবে জন্ম নিলে
কবে যাবো কালকবলে
কৃষ্ণেরে না হেরিয়া নয়নে।
হবে মন নিরাপদ
মন যাবে কৃষ্ণপদ
চল যাই যেথা বৃন্দাবনে।
যেথা হয় কৃষ্ণনাম
সেই বৃন্দাবন ধাম
মন মধ্যে করহ বিশ্বাস।
বন শব্দ মাত্র বন
বল এই ত্রিভুবন কৃষ্ণমনে করহ প্রকাশ।"

বৃন্দাবনে এক মুনি গভীর তপস্যায় ধ্যানমগ্ন। চারপাশে বন-বনানী। মুনিবর চোখ মেলছেন না। হঠাৎ তাঁর ধ্যানভঙ্গ হোল। চমকে উঠলেন। একি দেখছেন তিনি।

গাছের ডালে গুল্মলতা দিয়ে বাঁধা দোলনা। দোলনায় ঝুলছেন রাধাকৃষ্ণ। মুনিবর দুচোখ ভরে দেখছেন। হঠাৎ তিনি চীৎকার করে উঠলেন— পড়ে গেল, পড়ে গেল। আর কোন কথা নেই। তিনি সমাধিস্থ হলেন।

সেটা ছিল শ্রাবন মাসের পূর্ণিমা। এই দিনে রাধাকৃষ্ণের ঝুলন হয়েছিল। সেই থেকে শ্রাবন মাসের পূর্ণিমায় ঝুলন উৎসব হয়। ঝুলন সম্বন্ধে সঠিক কোন বিবরণ পাওয়া যায় না কোন গ্রন্থে। হয় তো বৃন্দাবনলীলার এও একটা অঙ্গ। সেই থেকেই সর্বত্র ঝুলনের প্রবর্ত্তন। দেশের সর্বত্রই রধাকৃষ্ণের মন্দিরে ঝুলন পূর্ণিমার দিন উৎসব হয়ে থাকে।

মহাপ্রভুর লীলাভূমি নদীয়া জেলার রানাঘাটে আজ থেকে সাড়ে পাঁচশো বছর কি তারও পূর্বে রাধাবল্লভের মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। তখন চারিদিক ছিল বন জঙ্গলে ভরা। একটা খড়ের চালা ঘরে রাধাবল্লভের নিত্যসেবা ও পূজা হ'ত। এ অঞ্চলের ভক্তবৃন্দ প্রতিদিন সন্ধ্যায় মন্দিরে এসে আরতি দেখতেন, প্রসাদ পেতেন। নিত্যপূজা ছাড়া অষ্টম দোল জন্মাষ্টমি ও ঝুলনের দিন বিশেষভাবে

পূজার্চ্চনা হ'ত। এই বিশেষ দিনে মন্দিরের আশপাশের বনজঙ্গল পরিষ্কার করে ছোটোখাটো একটা মেলা বসতো। মেলাতে আশপাশের গ্রাম থেকে দোকানীরা ফল-মূল, ছিঁড়ে-বাতাসা. হাঁড়ি-কলসীর দোকান নিয়ে আসতো। সন্ধ্যা হওয়ার আগেই মেলা ভেঙে সবাই যে যার আস্তানায় চলে যেতো। কারণ এ অঞ্চলে তখন ডাকাতের আডডা ছিল। বিখ্যাত রণা ডাকাত এই অঞ্চলের অধিবাসী ছিল। কেউ কেউ বলেন রণা ডাকাতের নাম থেকেই রাণাঘাট নামের উৎপত্তি হয়েছে।

এই ডাকাতের আরাধ্যা দেবী সিদ্ধেশ্বরী আজও রাণাঘাটে পূজিতা হচ্ছেন।

রাধাবল্লভ বিগ্রহ এখানে কে কবে প্রতিষ্ঠা করলেন তা সঠিক জানা যায় না। যেটুকু জানা যায় তা হচ্ছে এক সাধু একদিন তাঁর ঝোলার মধ্যে রাধাবল্লভ বিগ্রহ নিয়ে এসে এখানে পূজার্চনা করতে থাকেন। কয়েকদিন পর তিনি এখান থেকে চলে যাবার উদ্দেশ্যে রাধাবল্লভ বিগ্রহকে ঝোলার মধ্যে পুরে অগ্রসর হতে গিয়ে এক পাও এগোতে পারেন না। ঝোলা এত ভারী হ'ল কিসে ?

সেই রাতে রাধাবল্লভ তাঁকে স্বপ্নাদেশে বলেন তিনি কোথাও যাবেন না, এখানেই থাকবেন। সাধু বিগ্রহ রেখে পরদিন চলে গেলেন।

সবাই দেখলেন চালা ঘরের মন্দিরে রাধাবল্লভ একা বসে আছেন। তিনি যেন. সবাইকে দেখছেন। যেন বলছেন আর ভয় কি! এই তো আমি তোমাদের পড়শী হলাম।

"যে ডাকে তাঁকে, সে পড়ে না বিপাকে।"

আর ভাবনা কি ! বিপদের বন্ধু স্বয়ং রাধাবল্লভ যখন কৃপা করে এসেছেন তখন তাঁর সেবা, পূজা করতেই হ'বে।

মন্দিরের সামনে একটা কদম গাছ ছিল। প্রতি বছর অষ্টম দোলের সময় ঐ কদম গাছে অসময়ে একটা কদম ফুল ফুটতো। রাধাবল্লভের দোলমঞ্চে ফুলটাকে রাখা হ'ত।

অসময়ে গাছে ফুল ফোটে ?

একি আশ্চর্য ব্যাপার।

এ কাজ কে পারেন এ দুনিয়ায়।

পারেন তিনিই, যিনি সত্য-ত্রেতা দ্বাপর-কলি এই চার যুগেই অসাধ্য সাধন করেছেন।

১২৭১ সালে এক অগ্নিকাণ্ডে মন্দিরের আশপাশ সব পুড়ে যায়। কদম

গাছটার ডালপালা সব পুড়ে যায়, শুধু মূল কাণ্ডটা পুড়ে ফালি হোয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সবই তার ওপর দিয়ে চলে যায়।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য প্রতি বছরে অষ্টম দোলের দিনে ঐ পোড়া কদম গাছে একটা করে ফুল ফোটে—বহু বছর ধরে ফুটেছিল। তারপর গাছটি একদিন উপড়ে পড়ে গেছে।

ধীরে ধীরে চালাঘরের মন্দির পাকা দালান হয়। রাণাঘাটের পাল চৌধুরী বংশের ৺ব্রজনাথ পাল চৌধুরী এই মন্দিরের জন্য অনেক কিছু করেছেন। প্রতিদিন তাঁর সময় এক মণ দুধের পায়েশান্ন ভোগ হোত।

মন্দিরের রূপ দিন দিন পাল্টাতে থাকে। রাধাবল্লভ বহুদিন একাই ছিলেন পরে রাধিকার একটা মূর্তি নিয়ে এসে বসানো হয় রাধাবল্লভের বাম পার্শ্বে।

কালের করাল গ্রাসে সব কিছুরই পরিবর্তন হয়। গ্রাম রূপ নেয় শহরের। চারিদিকে বড় বড় দালান-কোঠা ওঠে, মানুষে মানুষে ভরে যায় সর্বত্র।

মানুষ বেড়েছে ঠিকই কিন্তু মনুষ্যত্ব বাড়েনি একটুও।

মন্দির হয়েছে এখানে ওখানে সেখানে। কিন্তু সে ভক্তি কোথায় ?

দেবতা আছেন মন্দিরে মন্দিরে কিন্তু কৃপা ভক্তি করছে কে ?

আজও প্রতি বছর ঝুলনের সময় রাধাবল্লভের ঝুলন দেখতে অনেক লোকেরা আসেন। "মৃৎশিল্পীরা নানান রকম পুতুল নিয়ে আসে, পাঁপর ভাজার গন্ধে চারিদিক ভরে যায়।"

ঝুলনের কয়েকদিন ধরে এ পাড়ায় ও পাড়ায় ছেলেমেয়েরা নানান রকম পুতুল সাজিয়ে ঝুলন করে।

রাধাবল্লভ আর শ্রীরাধিকা সিংহাসনে বসে আছেন। কি দেখছেন তিনি ?

দেখছেন মানুষও আজ ঝুলছে অনবরত দুঃখ দারিদ্র্যের দোলায়। চোখের জলের ফোঁটা গুণে দিন কাটছে। যার অনেক আছে তারও সুখ নেই, যার কিছু নেই তারও সুখ নেই। মানুষ সবাই ঝুলছে সংসারের দোলনায় অবিশ্বাসের ঝুলন মঞ্চে বসে। 'কি হোল' 'কি হোল' করছে। যত বেশী 'হায়-হায়' করছে ততই জোরে দোল দিচ্ছে আপনজন, যারা সংসারের বন্ধনে ঝুলনে। এ ঝুলনের শেষ হবে কবে। আর কবে এই মায়ার বন্ধন ছিঁড়ে পৌছাবে মানুষ তাঁরই কাছে।

রাধাবল্লভের ঝুলন দেখতে হলে রাণাঘাট আসতে হবে। রেল-ষ্টেশন থেকে

পথ বেশী দূর নয়।

এ মেলা আজ বিস্মৃতির মেলা।

এখানে এলে আজ সারা দেহমন যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ওঠে। মন্দির ভেঙে পড়ছে—দেওয়ালের ইট সব প্রকাশ হয়ে পড়ছে। দোলমঞ্চ ভগ্ন প্রায়, নাটমঞ্চও বিদ্রুপ করছে। এরই মাঝে রাধাবল্লভ শ্রীরাধিকাকে নিয়ে হয়তো শঙ্কার মধ্যেই দিন কাটাচ্ছেন। কবে বুঝি ভেঙে পড়ে।

তিনি কি সত্যিই শংকিত হয়েছেন!

হয়তো হয়েছেন - কিন্তু কেন?

শংকিত হয়েছেন এই কারণেই যে মানুষের মন মন্দিরেই থাকতে চায়। কিন্তু সেই মন্দিরের ভক্তি শ্রদ্ধার চুণকালি দিয়ে গড়া ইমারত ভেঙে পড়ে যদি, অবিশ্বাসের ইটকাঠ বেরিয়ে পড়ে, তাহলে তিনি কি থাকতে পারবেন?

সুখের বিষয় কয়েকজন ভক্ত মন্দিরটি সংস্কারে হাত দিয়েছেন। হয়তো মন্দিরের হারানো রূপ আবার ফিরে আসবে।

ঝুলনের সময় যদি এখানে কেউ একবার দেখে যান অসময়ের কাণ্ডারী রাধাবল্লভকে। যদি সামান্য ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে একবার এসে দর্শন করে যান তবে লাভ হবে আপনার অনেক।

সে লাভ অর্থ লাভ নয়।

সে লাভ পরম লাভ যার হিসাব খাতা-কলমে দেওয়া যাবে না।

ফুলিয়ার গাজনের উৎসব ও মেলা

"চড়কতলা শিবের গান
কি আনন্দ মাতায় প্রাণ।
কাঁসর বাজে, ঘণ্টা বাজে, বাজে ঢাক ঢোল
তোরা আনন্দেতে শিবঠাকুরের পূজার গান তোল।
মোরা শিবের চেলা যারা
চৈতে মোদের শিবের পূজা।
নাহি অন্য কাজ
দুয়ার দুয়ার ভিখ মেগে খাই
কিসের তাতে লাজ।
আয় তোরা সব আয় যে হেথা
গানে দে রে মন
ধান পাবি, কড়ি পাবি, জুড়াবে রে মন।"

এ গান শুনতে হলে যেতে হবে ফুলিয়ায়।

চৈত্র সংক্রান্তির দিন রাণাঘাট শান্তিপুর লাইনে ষ্টেশন ফুলিয়া, এখানে নেমে একটুখানি গেলেই পরেশনাথপুর গ্রামের মাঠ। সেখানেই বসে এই দিনে গাজনের মেলা। আশেপাশের ৫।১০টা গ্রাম থেকে আসে সন্ন্যাসীর দল। মাঠ ভরে মেলা বসে। লোকে লোকারণ্য হয়ে যায় পরেশনাথপুর গ্রাম। সে পরেশনাথপুর এখন আর নেই বললেই চলে। এখন প্রায় সবটাই ফুলিয়া কলোনী। দেশবিভাগের পর এ অঞ্চলটা জুড়ে হয়েছে কোয়ার্টারের পর কোয়ার্টার, পলিটেকনিক স্কুল, গ্রামসেবক কেন্দ্র, কৃষিফার্ম, হাসপাতাল, স্কুল, বাজার। ষ্টেশন থেকে সুর করে তাহেরপুর সীমানা পর্য্যন্ত মানুষ আর ঘর-বাড়ীতে জমজমাট। বিশ পঁচিশ বছর আগে কে জানত যে পতিত জমিতে আবার হবে মানুষের বসতি। বড় বড় জাত সাপের ঢিপির ওপর বসবে শিল্প কারখানা। বনঝোপ আর বাবলা গাছ কেটে সেখানে বসবে ছোট বড় টেক্সটাইল মিল।

মানুষ যেখানে সেখানে সবকিছু। ঘর বাঁধলেই সব বাঁধা পড়ে গেল।

মানুষের চিরন্তন শাশ্বতধর্ম, শিক্ষা-সংস্কৃতি, আচার-বিচার, হাসি, অশ্রু, গান সবই এসে ঘর ভরে যায়।

এবার এসে দাঁড়ান পরেশনাথপুর গাজনের মেলায়। এখানে এসেই নানা প্রশ্ন জাগবে আপনার মনে। এখানে এ মেলা কেন? কেন এই উৎসব? কোন ইতিহাস আছে নাকি এর?

আছে বৈকি! সব কিছুরই ইতিহাস আছে! আপনার, আমার, দেশের, দশের সবারই কিছু কিছু ইতিহাস আছে। আজকের মানুষ দেখলে মনে হবে এইসব নিরন্ন, নিরক্ষর, অনাহারে, অত্যাচারে, অবিচারে জর্জরিত মানুষের আবার ইতিহাস কি! এরা তো প্রাগৈতিহাসিক যুগের সরীসৃপ। ধুক্ ধুক্ করা প্রাণটা নিয়ে কোনমতে বুকে হেঁটে চলেছে জীবনের আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে। সবটা কিন্তু ঠিক নয়—এদের জীবনেও আছে রঙীন ইতিহাস। আশা আকাঙ্ক্ষার ইতিহাস, বাঁচার ইতিহাস।

মানুষের জীবনটা ভূগোল নয়?

গাজনের উৎসবেরও ইতিহাস আছে।

বহুদিন আগে এখানে চাষীপল্লীর কয়েকজন লোক চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজনের উৎসব করত। ঐ সময়ে কিছু দূরে তাহেরপুরে জনৈক ঘোষের এক ভগ্নীর মনসার ভর হোত। প্রতি বছর মনসার পূজার দিনে তার ভর হোত। সেই উপলক্ষে প্রতি বছর মনসা পূজা হোত। চাষীপল্লী থেকেও অনেক লোক যেত, পূজা দিয়ে প্রসাদ পেত। ওদেরই ভেতর একজন ললিত দাস জীবিত আছেন। তিনি মনে মনে ভাবতে থাকেন শিবের নামে তারা এত কষ্ট করেন, গোটা চৈত্র মাস ধরে তারা উপবাসও করেন। শিবনাম নিয়েই তাদের দিনরাত কাটে অথচ এমনই তাদের ভাগ্য আজও পর্যন্ত একটা উৎসব বা মেলা তারা করতে পারলেন না।

মা মনসাই বোধহয় শিবের চাইতে বেশী জাগ্রতা।

শিবকন্যা মনসাই জাগ্রতা দেবী।

এ আবার কেমন কথা!

চাষীপল্লীর কিছু লোক নিয়ে ললিত দাস তারকেশ্বর গেলেন।

সেখানে তিনি আদেশ পেলেন যে, মনপ্রাণ দিয়ে যে যা চাইবে তা অবশ্যই পাবে। তারা ভক্তি সহকারে শিবের উৎসব করুক, মনস্কামনা অবশ্যই পূর্ণ হবে। চাইলেই কি সব কিছু পাওয়া যায়?

যায় না, তবে কি করে পাওয়া যাবে!

পেতেই হবে, এই মন আছে যার সেই পাবে। এ মন তৈরী করতে গেলে জমির দরকার। সে জমি এই দেহের ভেতরই আছে। চোখের জলে সেই জমি ভেজাতে হবে, প্রেম দিয়ে কর্ষণ করতে হবে, ছড়াতে হবে ভক্তির বীজ; তবেই ফলবে জাগ্রত ফসল। সেই ভক্তির বীজের ফসল আজ ফুলিয়ার পরেশ-নাথপুরের গাজনের উৎসব।

আজও গাজনের দিনে এখানে সন্ন্যাসীরা কাঁটার ওপর ঝাঁপ মারে, জিভে বড়শী বিদ্ধ করে—সব মানুষ তা প্রত্যক্ষ করে।

ভগবান যদি ব্যথা দেন তাহলে ব্যথা পেতেই হবে। তিনি যদি ব্যথা না দেন তাহলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হলেও ব্যথা লাগবে না।

ললিত দাসকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে জবাব পাবেন—

"আপন সাধন কথা
না কহিও যথা তথা।"

মেলার ভিতর ঘুরতে ঘুরতে মনে হবে যেন এক নতুন দেশে এসেছেন। এখানে যেন সবই বিচিত্র। চারিদিকে শিবের নাম। এ জায়গাটা আজ যেন শিবময়!

দোকানও বসেছে কত রকমের। ধামা-কুলো, দা-বটি, মাটির পুতুল, কাঠের ও টিনের নানান রকম জিনিষও আমদানী হয়েছে।

গাজন ঘরের কাছে যেতেই কানে এলো সন্ন্যাসীদের গান—

"দয়াল মোদের শিবঠাকুর
দেশের খরা করেন দূর।
শিঙ্গা বাজে ম্যাঘের তরে
ঝড় জলরে বৃষ্টি ঝরে।
মোদের প্যাটে দেনরে ভাত
দয়াল ঠাকুর তারকনাথ।"

অল্পবয়স্ক সন্ন্যাসীও দেখলাম কয়েকজন। পরনে তাদের গেরুয়া কাপড়, মাথায় রুক্ষ চুল।

খানিক এগিয়ে দেখলাম বেশ ভীড় লেগেছে।

এক বাউল গান ধরেছে—

"কে গড়েছে এমন ঘর

ধন্য কারিগর
ঘরের মাপ চৌদ্দপোয়া
চৌদ্দ ভুবন তাঁর ভিতর।"

তার গলায় ঝুলছে লম্বা একটা সাইন বোর্ড ; তাতে লেখা—

	প্রশ্ন	উত্তর
১।	মানবজীবনের লক্ষ্য কি ?	আত্মোপলব্ধি
২।	ধর্ম কি ?	সত্য
৩।	ধর্মলাভের উপায় কি ?	বাসনা ত্যাগ
৪।	নরকবাস কি ?	অসৎসঙ্গ
৫।	স্বর্গবাস কি ?	সাধুসঙ্গ
৬।	বন্ধন কি ?	বিষয়ানুরাগ
৭।	মুক্তির উপায় কি ?	সদ্‌গুরুর উপদেশ গ্রহণ
৮।	মহাপুণ্য কি ?	মুমুক্ষু
৯।	মহাপাপ কি ?	স্বার্থপরতা
১০।	মহাশক্তি কি ?	ধৈর্য্য
১১।	মহাসম্বল কি ?	আত্মবিশ্বাস
১২।	মহামৃত্যু কি ?	আত্মবিস্মৃতি
১৩।	মহাশত্রু কে ?	আলস্য
১৪।	মহামিত্র কে ?	অধ্যবসায়
১৫।	অর্থশালী কে ?	যিনি সর্বদা সন্তুষ্ট
১৬।	জগজ্জয়ী কে ?	যিনি মন জয় করিয়াছেন

একেবারে সামনে গিয়ে দেখলাম মাধব দাস বাউলকে।

জয়দেবের মেলায় একে দেখেছিলাম।

বললাম—জয়দেবের মেলায় দেখেছিলাম না ?

—হ্যা বাবু !

—এখানে যে—

—এলাম ঘুরতে ঘুরতে।

—এরপর কোথায় যাবে—

—রাত পোহালেই যাবো কোন্নগর। সেখানে মনসাতলায় ১লা বৈশাখ থেকে বাসি চড়কের মেলা বসবে।

মাধব দাস আপনমনে সুর ভাঁজে।

আমাকেও যেতে হবে। বাইরে এসেছিলাম আবার ঘরে ফিরতে হবে। যে ঘরে সাপ নেউলের বাস। যেখানে অসত্য আর হিংসার আগাছায় ভরা আছে সারা অঙ্গন।

আমার আপন ঘরের ঠিকানা কোথায় পাই ?

ফুলিয়ার কৃত্তিবাস ও হরিদাসের সাধনপীঠ

ফুলিয়া—

কি অপূর্ব কাব্যময় নাম। এই তিন অক্ষরের মধ্যে জড়ানো রয়েছে বাংলার এক মহাকাব্য। আর আছে এক মহান জ্ঞানতপস্বী সাধক কবির নাম।

বাংলা তথা ভারতের প্রাণপ্রতিম মহাকবি কৃত্তিবাসের কথাই বলছি। নিজের কীর্তিতেই মহীয়ান গরীয়ান সেই অমর সাধক কবি কৃত্তিবাসের ফুলিয়া আজ পুণ্যতীর্থে পরিণত হয়েছে।

"জনক জননী তব দিল শুভক্ষণে
কৃত্তিবাস নাম তোমার! কীর্ত্তির বসতি
সতত তোমার নাম সুবঙ্গ ভবনে
কোকিলের কণ্ঠে যথা স্বর, কবিপতি
গাওগো রামের নাম সুমধুর তালে
কবিপিতা বাল্মীকিরে তপে তুষ্ট করি"

—মধুসূদন

মাইকেল অবাক বিস্ময়ে বলেছিলেন তারপর—কি আশ্চর্য্য রামায়ণ কৃত্তিবাসের। অমৃত নিস্যন্দী লেখা। বটতলাতেও পড়ছে। তিন তলাতেও পড়ছে।

"গঙ্গার সম্মুখে গ্রাম স্তোভুল্য নাম ফুলে
পল্লী বিশ্বগড় মুখো ত্রিবিক্রমের বলে।
পার্শ্বে কপিল বদরিকা তীর্থদ্বয়
শান্তি জন্য যত্র আসে মুনিচয়।"

আজেকের ফুলিয়া বা ফুলে, আগে ফুলবাটি নামেই চলিত ছিল। ১৩৫৪ শকে ২৯শে মাঘ কৃত্তিবাস এই ফুলিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন এক মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে। কবির জন্মদিন ছিল রবিবার। তার জন্ম সময় নিয়ে কিছু মতান্তর দেখা যায়। কৃত্তিবাস কোন্ শতাব্দীতে জন্মেছিলেন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। মতানৈক্য ঘটেছে সন তারিখ আর বার নিয়ে। পূর্ণ মাস হোলে শেষদিন হয় মাঘী সংক্রান্তি।

আচার্য্য যোগেশ চন্দ্র রায় বলেছেন ১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই তিনটির (বার, তিথি ও সংক্রান্তি) যোগাযোগ ঘটেছিল মাত্র দুবার। প্রথমবার ১৩৩৭ খ্রীষ্টাব্দ ফেব্রুয়ারী ৩০শে মাঘ। দ্বিতীয়বার, ১৪৩২ খ্রীষ্টাব্দ ফেব্রুয়ারী ২৯শে মাঘ। তার হিসাব মতে কৃত্তিবাস জন্মে ছিলেন ১৪৩২ খ্রীষ্টাব্দে। আবার কেউ বলেন ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে (স্মৃতি স্তম্ভের গায় লেখা আছে।)

সাল, বার ও তারিখ নিয়ে যে দ্বন্দ্ব চলেছে তার মেঘ এখনও কাটেনি তবুও সবার ওপর বড় সত্য, সত্য যে কৃত্তিবাস বাংলারই মানুষ। বাংলার মাটিতেই জন্মেছিলেন। বাংলার মানুষ সে জন্য গর্বিত। এর চেয়ে সত্য আর কি আছে ?

তিনি কবে কোন তারিখে জন্মেছিলেন। সঠিক তথ্য নিয়ে যদি কোন মেঘ জমে থাকে তাতে ক্ষতি কি। কৃত্তিবাসের জীবন মহৎ তাই তো মহান সৃষ্টি দিয়ে বাংলা ও বাঙ্গালীকে বিশ্বের দরবারে সসম্মানে অধিষ্ঠিত করেছেন।

"গ্রামরত্ন ফুলিয়া যে জগতে বাখানি
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিনী।"

পাঁচ শ' বছর আগে যে গঙ্গার মন্দাকিনী ধারা কবির সাধন ক্ষেত্রের পাশ দিয়ে বয়ে যেতো সে গঙ্গা আজ লুপ্ত হয়েছে। ফুলিয়া থেকে চার মাইল দূর দিয়ে আজ গঙ্গার প্রবাহ। পূর্বকালে ফুলিয়া মহাসম্ভ্রান্ত সমৃদ্ধ ও কুলীন গ্রাম ছিল। বহু পণ্ডিত শিরোমনির বাসও ছিল তখন। কবির স্মৃতিস্তম্ভের এক পাশে আজ শুধু চষা মাঠ। দেখলে অবশ্য মনে হয় একদিন গঙ্গা এইখান দিয়েই বয়ে যেতো, আজ তা লোকচক্ষুর অন্তরালে। কৃত্তিবাসের ফুলিয়া রত্নপ্রসবিনী হয়েও আজ নিশ্চিহ্নপ্রায়। এক রকম জনমানবশূন্য বললেও হয়। কালের কপোল তলে সব কিছুরই বুঝি এই ভাবেই শেষ। গঙ্গার কুলুকুলু ধ্বনি আজ আর শোনা যায় না, কোথায় সেই পণ্ডিত শিরোমনির দল যারা একদিন পাঁচশো বছর আগে কৃত্তিবাসকে বাংলা ভাষায় রামায়ণ রচনার জন্য 'সর্বনেশে' আখ্যা দিয়েছিলেন। কৃতিপুরুষ কৃত্তিবাস তাদের সমালোচনায় ভ্রূক্ষেপ করেননি তাই আজ বাংলা ভাষার আদি কাব্য রামায়ণ রচনা হয়েছে তা না হলে বাংলা কেন সারা ভারতবর্ষকে হয়তো আজ এক অমৃত রসের আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হ'তে হ'ত।

কৃত্তিবাসের পঞ্চম উর্দ্ধতন পুরুষ নরসিংহ ওঝা ছিলেন সুবর্ণ গ্রামের অধিপতি

'বেদানুজের' মন্ত্রী। সেখানে অরাজকতা সুরু হওয়ায় তিনি সে স্থান ত্যাগ করে ভাগিরথীর তীরে এই ফুলিয়া গ্রামে আসেন।

'মালিনী নামেতে মাতা পিতা, বনমালী
ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী'।

কৃত্তিবাস এই ছয়টি পুত্রের অন্যতম। অপর পাঁচভাই হলেন শান্তিমাধব, মৃত্যুঞ্জয়, শ্রীধর, বলভদ্র ও চতুর্ভুজ। কৃত্তিবাসের পিতামহ মুরারী ওঝাও বেশ সুপণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন। শৈশবে কৃত্তিবাস ভাইদের সাথে চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করেন। কেউ কেউ বলেন গৌড়েশ্বর ছিলেন তখন তাহেরপুরের রাজা কংস-নারায়ণ, আবার কেউ বলেন তিনি ভাতুরিয়ার রাজা গণেশ বা দনুজমর্দ্দনদেব। এই গৌড়েশ্বরের রাজসভাতেই কৃত্তিবাসের কীর্তির প্রথম সৌরভ।

"বাল্মীকি হইতে হইল রামায়ণ প্রকাশ
লোক বুঝাইতে করিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস।"

গৌড়াধিপতি রাজা গনেশ ছিলেন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা। তিনি অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তখনকার পণ্ডিতদের এই ধারণা ছিল যে "গৌড়েশ্বরে পূজিলে হয় গুণের পূজা।"

তখন মাঘ মাস। বেলা যায় যায়। গৌড়েশ্বর রাজসভা অলংকৃত করে বসে আছেন। নৃত্যগীতে রাজসভা মুগ্ধ। গৌড়েশ্বরের দক্ষিণে পাত্র জগদানন্দ। পাশে সুনন্দ। বামে কেদার খাঁ ও নারায়ণ। আর একদিকে গন্ধর্ব রায়। রাজপণ্ডিত মুকুন্দও সমাসীন।

কৃত্তিবাস বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। সময় চলে যায়।

কৃত্তিবাস অধীর।

এমন সময় দ্বারী এসে জানালে—

"কার নাম ফুলিয়ার মুখুটি কৃত্তিবাস
রাজার আদেশ হইল করহ সম্ভাষ।"

কৃত্তিবাস রাজসভায় সাতটি বিচিত্র ছন্দোমধুর শ্লোক আবৃত্তি করে শোনালেন--

সমস্ত সভাস্থল নিস্তব্ধ। কবির মুখের অপূর্ব কাব্য গাঁথা শুনে সবাই মোহিত।

গৌড়েশ্বর বললেন—এই কবিকে কি পুরস্কার আমি দিতে পারি?

রাজপণ্ডিত মুকুন্দ ধীরে ধীরে উঠে এসে কবি কৃত্তিবাসকে জয়মাল্য পরিয়ে

দিয়ে বললেন—

"শুন দ্বিজরাজ
যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজ"

কৃত্তিবাস ভিক্ষার্থী নন।

যে সম্পদের অধিকারী তিনি, তার চেয়ে মূল্যবান সম্পদ কি দিতে পারে এই গৌড়েশ্বর। সংসারে চিরস্থায়ী কিছুই নয়। ধন দৌলত ঐশ্বর্য্য সব ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হয়ে যায়। শুধু কীর্তি আর গৌরবই এ সংসারে চিরকাল বেঁচে থাকবে। তাই কৃত্তিবাস বললেন—

"কারও কিছু নাহি লই করি পরিহার
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার"

কৃত্তিবাস নিজেই কীর্তিময়।

মানুষের কাছে তিনি হাত পাতেননি।

বাঙালীর ভাব ও ভাষাকে তিনি রূপান্তরিত করে এক যুগান্তর আনলেন। বাঙালীর হৃদয়ের সঙ্গে মিল রেখে ভাবধারার সমন্বয় ঘটিয়ে তিনি সৃষ্টি করলেন বাল্মিকী রামায়ণের এক মধুর রূপ যা বাংলার নিজস্ব সম্পদ হয়ে রইল। বাঙালীকে তিনি যা দিয়ে গেলেন তার সমাধির ওপর স্বর্ণমন্দির তৈরী করলেও সারাজাতি তার ঋণ শোধ করতে পারবেন না।

৪৫ বছর আগে বাংলার সাহিত্যমণ্ডলীর চেষ্টায় কৃত্তিবাসের একটা স্মৃতিস্তম্ভ ফুলিয়ায় তৈরী হয়েছে। তাতে লেখা আছে—

মহাকবি কৃত্তিবাসের
আবির্ভাব ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দ, মাঘ মাস শ্রীপঞ্চমী রবিবার।
হেথা দ্বিজোত্তম
আদি কবি বাঙ্গালার ভাষারামায়ণকার
কৃত্তিবাস লভিলা জনম
সুরভিত সুকবিত্বে ফুলিয়ার পুণ্যতীর্থে
হে পথিক সম্ভ্রমে প্রণম।

এই স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তি রচনা করেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ২৭ শে চৈত্র ১৩২২ খ্রীষ্টাব্দ। সেই সময় ইষ্টার্ন বেংগল রেলওয়ের তৎকালীন জনসংযোগ কর্তা ডক্টর নৃপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁর পুস্তকে লিখেছিলেন—

"সমাধি স্তম্ভের দক্ষিণ দিকে একটা প্রাচীন বট বৃক্ষের নীচে একটা ইষ্টক স্তূপ আছে। উহা কৃত্তিবাসের নীলমঞ্চ নামে পরিচিত। চতুর্পার্শ্বস্থ জমি হইতে কৃত্তিবাসের জন্মভিটা অনেক উচ্চ। অনুমান হয় এই স্থান খনন করিলে অনেক অট্টালিকার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।"

রামায়ণ সর্বভারতের জিনিষ। সারা ভারতবর্ষের আত্মাই যেন রামায়ণের মধ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন মানুষের মধ্যে নানা বিষয়ে নানান রকম প্রভেদ। এক প্রদেশের মানুষের রুচি চালচলন আর এক প্রদেশের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু বিভিন্ন ভাষায় রচিত রামায়ণের মাধ্যমে সমস্ত ভারতবাসীই এক সূত্রে গাঁথা। উত্তর ভারতের 'রামচরিতমানসের' তুলসীদাস, দক্ষিণ ভারতের 'রামাবতরণ' রামায়ণের 'কামবান' আর বাংলায় রামায়ণ করে কৃত্তিবাস তা সম্ভব করেছেন। ভারতবর্ষের জীবন-বেদই ফুটে উঠেছে রামায়ণে। তাই রাম লক্ষ্মণ সীতা অযোধ্যাবাসী হয়েও যেন বাংলারই মানুষ। সীতার চোখের জলে বাংলার মাটি যত ভিজেছে তত বোধহয় কোন দেশেরই হয়নি। সরযূ আর ভাগিরথীর জলে সীতার চোখের জল আজও যেন মিশে আছে। বাঙালীর অন্তরের সঙ্গে কৃত্তিবাসের অন্তর যোগ প্রবল ছিল তা না হলে বাংলার ঘরের কথা তিনি এত জানলেন কি করে।

কৃত্তিবাসের স্মৃতি স্তম্ভের পাশে একটা কূপ আছে। লোকে বলে 'কৃত্তিবাস কূপ'। প্রতি বছর মাঘ মাসের শেষে এই স্মৃতিস্তম্ভের পাশে মহাকবির স্মরণোৎসব হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু কবি সাহিত্যিকের আগমনে এই সময়টা সাহিত্য তীর্থে পরিণত হয় এই ফুলিয়া গ্রাম। রামায়ণ গান, রামায়ণ প্রদর্শনী ও বিরাট মেলা বসে। দূর দূরান্ত থেকে গানের দল আসে।

পঁয়তাল্লিস বছর পর পুণ্যতীর্থ ফুলিয়ায় মহাকবি কৃত্তিবাসের স্মৃতিরক্ষার্থে একটা ইমারত নির্মাণের প্রস্তাব হয়েছে। এই স্মৃতিসৌধের সঙ্গে থাকবে সভা-গৃহ ও সংগ্রহশালা। এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৪০ হাজার টাকা বরাদ্দও করেছেন।

ইংলণ্ডে সেক্সপীয়ারের জন্মভিটাতেও সংগ্রহশালা ও স্মৃতিমন্দির আছে। প্রতিবছর সেখানেও তার জন্মদিনে দেশ বিদেশের মানুষ এসে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয়।

এমন দিন আসবে যেদিন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে এসে মানুষ একদিনের জন্যেও গিয়ে ফুলিয়া গ্রামে কবি কৃত্তিবাসের স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে যাবেন।

কিন্তু একটা গভীর অনুতাপের কথাও বলতে হয়। মহাকবির রামায়ণ আজ কজন বাঙালীর ঘরে পূর্ণমর্য্যাদায় অধিষ্ঠিত। সস্তা নাটক নভেলে দেশ ছেয়ে গেছে। রামায়ণের পবিত্র সিংহাসন আবর্জনার স্তূপে আজ প্রায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। কেন এ অনাদর বিশেষ করে শিক্ষিত বাঙালীর শহুরকেন্দ্রিক জীবনে?

সেকালে চামর দুলিয়ে রামায়ণ গান গেয়ে গেয়ে বেড়াতো রামায়ণের দল। আজ তারা কোথায়? চণ্ডী মণ্ডপে একজন বসে রামায়ণ পাঠ করত আর গ্রামের ছেলে বুড়ো সবাই মিলে সেই পাঠ শুনতো। অল্প কিছুদিন পর এ সব কথা দেখা যাচ্ছে কীংবদন্তী হয়ে দাঁড়াবে।

একালের মা বোনেরা রামায়ণ খুব বেশী কেউ পড়েন না বলেই বোধ হয় কৃত্তিবাসের রামের মত ভাই লক্ষ্মণের মত দেবর আর সীতার মত জননীসমা সহিষ্ণু শক্তিময়ী নারীর আজ অভাব ঘটছে। অথচ আদর্শ বাঙালী পরিবারের রূপকল্প মনে নিয়ে তার আশাতেই আমরা প্রতি বছর মহাকবির স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে আসি।

নদীয়া জেলার রাণাঘাট থেকে দুটো রাস্তা চলে গেছে শান্তিপুর পর্যন্ত। রেলপথে রাণাঘাট থেকে ফুলিয়া রেল ষ্টেশানে নেমে সেখান থেকে পীচের রাস্তা ধরে ফুলিয়ায় যাওয়া যায় আবার রাণাঘাট থেকে বহরমপুর রোড ধরে বাসেও সোজা পৌছান যায়। আজ কয়েকবছর ধরে রাণাঘাট থেকে কাল্না বলাগড়গামী বাসে গিয়ে একেবারে কবির স্মৃতি স্তম্ভের পাশেও নামা যায়।

কৃত্তিবাসের জন্মভিটার অতি নিকটে হরিদাস ঠাকুরের সাধন পীঠও ফুলিয়ার আর এক আকর্ষণ। দুপাশে বাঁশ ঝাড়, মাঝখান দিয়ে সরু এক পেয়ে মাটির পথ। সামান্য একটু গেলেই যবন হরিদাসের সাধন পীঠ। যবন হরিদাস বেনাপোল ত্যাগ করে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের সঙ্গে মিলিত হন এবং ফুলিয়ার গঙ্গার তীরে একটা মাটির ঘরে সাধন ভজন করতেন। মুসলমান হয়ে হিন্দু ধর্মের প্রতি এত আকৃষ্ট দেখে মুলুকপতি তাঁকে বাজারে নিয়ে গিয়ে বেত্রাঘাত করবার আদেশ দেন। কিন্তু বেত্রাঘাত খেয়েও ঠাকুর হরিনাম ছাড়েন না। চোখে তাঁর অবিরাম ধারা। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে কেঁদে ওঠেন—

খণ্ড খণ্ড হয় যদি এই দেহ প্রাণ
তবুও না ছাড়িব আমি মধুর হরিণাম।

হরিণাম যার সারা অঙ্গে জড়ানো তাকে বেত্রাঘাতে পরাভূত করে কে? তিনি

কাউকে দোষারোপ করলেন না। কাউকে অভিশাপ দিলেন না। তাঁর আরাধ্য দেবতার কাছে প্রার্থনা জানালেন—

"এসব জীবেদের প্রভু করহ প্রসাদ
মোরে দ্রোহে নহু এ সবার অপরাধ।"

বৈষ্ণব জগতে তাই যবন হরিদাসের স্থান অনেক উঁচুতে। মহাপ্রভু তাঁকে "পৃথিবীর শিরোমণি" আখ্যা দেন।

হরিদাসের সাধণ পীঠে একটি কূপ আছে। 'হরিদাস কূপ নামেই তার খ্যাতি। কথিত আছে হরিদাস এই কূপের ওপরে বসেই সাধনা করতেন। এখানকার পরিবেশ অপূর্ব মনোরম। নিরব নিস্তব্ধ চারিদিক। সারা প্রকৃতি যেন বসে আছে প্রশান্ত ভঙ্গীতে ধ্যানাসনে। মাঝে মাঝে শুধু বাঁশ পাতার শনশনানী। হয়তো ভক্তের কানে মনে হবে ঐ শব্দের মধ্যেও আছে হরিনামের সুর।

কাটোয়ার কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণের পর মহাপ্রভু নীলাচলে যাওয়ার পথে সবার আগে ফুলিয়ায় হরিদাস ঠাকুরের আশ্রমে আসেন। সারা নবদ্বীপবাসী এইখানেই মহাপ্রভুর দর্শন করেন। সত্যের আদর এবং আদর্শের জন্য সব কিছু ঘটাই যেন নদীয়ায় সম্ভব। নদীয়াবাসী যুগান্তকারী দৃষ্টান্তের জন্য যেন কালে কালে তৈরী হয়ে বসে থাকে।

এখানে একটি মন্দিয়ের মধ্যে বলরাম, রেবতী শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার বিগ্রহ রয়েছে? মন্দিরের সামনে তুলসী বেদী ও কৃত্তিবাসের সমাধি নামে অপর একটি বেদীও আছে।

কৃত্তিবাস আজ নেই।

ঠাকুর হরিদাসও নেই কিন্তু আছে ফুলিয়া। আছে রামায়ণ, আছে হরির নাম। বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে। হয়তো হাজার হাজার বছর চলে যাবে। গড়বীর ইতিহাসেরও হয়তো হাজারো পরিবর্তন হবে কিন্তু নদীয়ার মাটি বাংলার ঐতিহ্যকে প্রাণ দিয়ে রাখবে। শক্তির বিরুদ্ধে, কালের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার ইতিহাস ইতিহাস হয়েই থাকে।

———

শান্তিপুর ভাঙা রাসের মেলা

শুধু পঞ্চাশ একশো বছর নয়।

আটশো কি তারও বেশী বছর ধরে শান্তিপুরের নাম।

শান্তিপুরের ভাঙা রাসের কথা জানে না এমন লোক এদেশে আছে কিনা সন্দেহ। রাসের কথা মনে হলেই আগে মনে পড়ে শান্তিপুরের নাম। শান্ত নামে এক মুনি বাস কোরতেন শান্তিপুরে সেই থেকেই নাকি এর নাম শান্তিপুর; পতিতপাবনী গঙ্গা শান্তিপুরের তিনদিক দিয়ে বয়ে যেতো। বর্তমানে কেবল মাত্র পশ্চিম দিকে বয়ে গেছে। আগেকার দিনে মুমূর্ষু রোগীকে শান্তিপুর গঙ্গার ধারে নিয়ে আসা হোত যদি কেউ এখানে এসে সুস্থ হোয়ে যেতো তাহলে সে আর নাকি সংসারে ফিরে যেতো না। গঙ্গার ধারে যাতে শান্তিতে বাস কোরতে পারে সেই ব্যবস্থাই কোরে নিত। কেউ কেউ বলেন শান্তিপ্রিয় লোকের বাস বোলেই শান্তিপুর নামকরণ হোয়েছে।

শান্তিপুরের রাস বিখ্যাত—রাস উপলক্ষে যা জনসমাগম হয় তা পশ্চিমবঙ্গের আর কোন পুজোপার্বণ বা মেলাতে হয় না। রাস উপলক্ষে শান্তিপুরে সুদূর ত্রিপুরা, মানপুর থেকেও মানুষ আসে। প্রতি বছর অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমার দু'তিন দিন আগে থেকেই শান্তিপুরে লোক আসা শুরু হয়। নবদ্বীপের রাস ভেঙে যাবার পরদিনই শান্তিপুরের রাস ও মেলা। এদিনে সারা শান্তিপুর ঘিরে জনসমুদ্রের ঢেউ চলে। ষ্টেশন থেকে পথে। পথ থেকে বাড়ীতে বাড়ীতে সর্বত্রই সমান ভীড়। এই সময় দূরদেশ থেকে বহু আত্মীয়স্বজনও আসে বাড়ীতে বাড়ীতে। দুপুরবেলা থেকেই শোভাযাত্রার রাস্তার আশেপাশের বাড়ীর ছাদ ও বারান্দা দখল হোয়ে যায়।

যায়গা নিতে হবে, তা না হোলে কোন কিছুই দেখা যাবে না। শান্তিপুরের যত ঠাকুর সবই একই রাস্তায় শোভাযাত্রা কোরে যায়। ঠাকুরের সিংহাসন ও চতুর্দোলার সাজ-সজ্জা দেখার মত। কতরকম আলো, কতরকম সাজ, লোক-শিল্পের যত কিছু সবই এদিন রাসের মেলায় দেখা যায়।

পথের দু'পাশ দিয়ে রকমারী দোকান, বাদাম আর পাঁপর ভাজার গন্ধে চারিদিক ভরপুর। ভেঁপু বাঁশীর আওয়াজ আর বেলুনওড়া পূর্ণিমার আকাশ এক নতুন রূপ ধরে। রাত্রি ৮ থেকে ৯ টার মধ্যে শোভাযাত্রা শুরু হয়।

সমস্ত ঠাকুরের শোভাযাত্রা শেষ হোতে রাত ভোর হোয়ে যায়। গোস্বামীদের বিগ্রহ প্রথমেই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। রাস্তায়, বারান্দায়, ছাদে কারও চোখে ঘুম নেই—এদিন শান্তিপুরে যেন ঘুম থাকে না—সবাই জেগেই রাত কাটায়। জাগ্রত মানুষের কি অসীম ধৈর্য—একভাবে বসে বা দাঁড়িয়ে সারারাত ধরে ঠাকুর দর্শন করে। ঘুম কি কারও চোখে থাকার উপায় আছে।

ঘুমিয়ে পড়লে তো জাগ্রত দেবতার দর্শন মিলবে না।

কে জানে এরই মাঝে কোন ফাঁকে রাধাকৃষ্ণ হয়তো দর্শন দিয়ে চলে যাবেন।

ঘুমুলে তো প্রাণের ঠাকুর জাগবে না।

জেগেই জাগাতে হ'বে জাগ্রত ঠাকুরকে। এক ভাবে এক মনে, এক ধ্যানে এক জ্ঞানে।

এদিন জায়গা নিয়ে বিরোধ বেশী হয় না। সবাই সবাইকে দেখার সুযোগ কোরে দেয়। রাসের মেলা শুধু নয় এদিন। মানুষের মিলন মেলা। সবার সঙ্গে না মিললে তো মেলা হয় না। সন্ত তুলসীদাসের দোঁহা মনে পড়ে—

"তুলসী জগ্‌মে আওকে সব্‌ছে মিলিও ধায়।
না জানে কোন বেশ্‌মে নারায়ণ মিল্ যায়॥"

অর্থাৎ পৃথিবীতে এসে মিলে মিশে থাকাই ভাল। সবাইকে ভালবাসার জন্য। সবার সঙ্গে মিলবার জন্য ছোটাছুটি কোরতে হ'বে কারণ কেউ কি বোলতে পারে কোন বেশে নারায়ণ এসে কাকে দেখা দেবেন।

বৈষ্ণবদের এক পরম পীঠস্থান শান্তিপুর। এর পাশেই বাবলা গ্রামে অদ্বৈত আচার্যের পাটবাড়ী। বারো বছর বয়সে তিনি শান্তিপুর এসেছিলেন তখন তাঁর নাম ছিল কমলাক্ষ। পরে হোলেন অদ্বৈত আচার্য। ঠিক যেমন কুঁড়ি থেকে ফুল, শ্রদ্ধাভক্তির আধার ছিলেন তিনি। তাঁরই ভক্তিতে আকৃষ্ট হোয়ে মহাপ্রভু নবদ্বীপে অবতীর্ণ হন।

"অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য অবতার।
সেই প্রভু কহিয়াছেন বার বার॥"

অদ্বৈত আচার্যের বয়স যখন ৫২ বছর তখন চৈতন্যদেব জন্মালেন। ১২৫ বছর বয়সে অদ্বৈত আচার্য শান্তিপুরে দেহত্যাগ করেন।

মন্দির দিয়ে ঘেরা শান্তিপুর। শ্যামচাঁদ, গোকুলচাঁদ, জলেশ্বর মহাদেব তার মধ্যে প্রধান। শ্যামচাঁদের মন্দির ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিপুর নিবাসী রামগোপাল

খাঁ চৌধুরী দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করেন। বাংলার বহু বড় বড় পণ্ডিত মন্দির প্রতিষ্ঠাদিবসে নিমন্ত্রিত হন। নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে এক লক্ষ টাকা নজর দিয়ে সম্বর্ধনা জানানো হোয়েছিল। এখানে বড়বাজারে সিদ্ধেশ্বরী মাতার বিরাট এক বিগ্রহ আছে। রসরাজ গোপালভাঁড় শান্তিপুরেরই অধিবাসী ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আশানন্দ মুখোপাধ্যায় নামে এক বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন শান্তিপুরে। বিপন্নের উদ্ধারই তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। একবার এক বাড়ীতে ডাকাত পড়লে অন্য কিছু না পেয়ে তিনি ঢেঁকিশাল থেকে ঢেঁকি নিয়েই ডাকাত দলকে তাড়িয়ে দেন। সেই থেকে তাঁর নাম হয় আশানন্দ ঢেঁকি। আজও শান্তিপুরে তাঁর একটা স্মৃতিস্তম্ভ আছে।

বর্তমান যুগের অন্যতম মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী শান্তিপুর অদ্বৈত বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিপুরে সংস্কৃত টোলের সংখ্যা ছিল অনেক। হরিমোহন প্রামাণিক নামে একজন পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষায় "কোকিলদূতম কাব্য" ও "কমল করুণা বিলাসম্" নাটক লেখেন। অম্বিকা গ্রামে গৌরিদাস পণ্ডিত নামে একজন চৈতন্য অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। চৈতন্যদেবের স্বহস্তলিখিত গীতা তাঁর কাছে ছিল। কিছুদূরে বাগআঁচড়া গ্রামে বাগদেবীর এক বিরাট বিগ্রহ আছে।

এখানে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রঘুনন্দন বন্দোপাধ্যায় নামক একজন সাধক সিদ্ধিলাভ করেন। আরও কিছুদূরে ব্রহ্মশাসন গ্রামে এক বিরাট শিবলিঙ্গ আছে।

শান্তিপুরের ভাঙা রাসের সময় মানুষের আসা যাওয়ার শেষ নেই। কতকাল ধরে যে এই মানুষের মেলা চলছে তা কে জানে। আরও কতকাল কেটে যাবে মানুষ আসবে ঠিকই। এ তো ভাঙা রাসের মেলা নয়, এ যে মনপ্রাণ জোড়া দেবার মেলা।

আড়ংঘাটায় যুগলকিশোর ও বীরনগরের উলাইচণ্ডীর মেলা

বৃন্দাবন থেকে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ নিয়ে এলেন গঙ্গারাম দাস। তিনি প্রথমে নবদ্বীপের কাছে সমুদ্রগড়ে মূর্তিটি স্থাপন কোরলেন। বাংলায় তখন বর্গীর অত্যাচার চলছে, তাদের উপদ্রবে সবাই শংকিত! উপায়ান্তর না দেখে বিগ্রহটি নিয়ে গঙ্গারাম চলে এলেন আড়ংঘাটায়, চূর্ণী নদীর তীরে। নদীর দু'পারে বন-বনানী, আম-কাঁঠালের বাগান আর বাঁশঝাড়। মনুষ্য বসতিও খুব বেশী নয়। চূর্ণী নদী কুল কুল শব্দে বয়ে চলেছে।

গঙ্গারামকে আশ্রয় দিলেন জনৈক বণিক। একটী মন্দিরও তৈরী হোল। শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপন করা হোল সেই মন্দিরে।

সেটা ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দ.

শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের পূজা চলতে থাকে ভক্তি ও নিষ্ঠা দিয়ে। মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ একা।

রাধা ছাড়া কৃষ্ণ। এ কি কল্পনা করা যায়। জমিদাতা বণিক শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা কোরে নিজেই যেন আশ্রয় পেলেন, কিন্তু মন যেন কারও ভরে না; না গঙ্গারামের, না গ্রামের লোকের।

কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ঠিক এমনি সময়ে একটী রাধা মূর্তি এনে শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বে প্রতিষ্ঠা কোরে নাম দিলেন যুগলকিশোর। আড়ংঘাটায় চূর্ণী নদীর তীরে আজ এই মন্দির যুগলকিশোর মন্দির নামে খ্যাত।

রবীন্দ্রনাথের "দেবতার গ্রাস" কবিতায় চূর্ণী নদীর নাম অমর হোয়ে আছে।

"হেমন্তের প্রভাত শিশিরে
ছলছল করে গ্রাম চূর্ণী নদী তীরে"

কোলকাতা থেকে ৫১ মাইল দূরে আড়ংঘাটা স্টেশন। রাণাঘাট বানপুর লাইনে রাণাঘাটের পরের ষ্টেশনই আড়ংঘাটা। ষ্টেশন থেকে পাঁচ মিনিটের পথ যুগলকিশোর মন্দির পাশে চূর্ণী বয়ে চলেছে। ঢেউগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হোয়ে এদিক ওদিক ছিটিয়ে পড়েছে মিছরি ছেটানোর মত। সারা জ্যৈষ্ঠ মাস ধরে এখানে যুগলকিশোর মন্দির ঘিরে বিরাট মেলা বসে। অনেক দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসে এই মেলায়। হাঁটাপথে, নদীপথে; রেলপথে সারা জ্যৈষ্ঠ মাসই মানুষের আনাগোনা চলে। দোকানপাটে ভরে যায় মেলার জায়গা। যাঁরা

আসেন তাঁদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই বেশী, কারণ তাঁদের মধ্যে একটা বিশ্বাস বহুকাল থেকে দানা বেঁধে আছে যে, জ্যৈষ্ঠ মাসে যুগলকিশোর দর্শন কোরলে ইহজন্মে পরজন্মে আর বৈধব্য ভোগ করতে হয় না।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র যুগলকিশোরের সেবা চালানোর জন্য বহু নিষ্কর জমি দান কোরেছেন।

কথিত আছে, একবার যুগলকিশোরের ধানের গোলা আগুনে পুড়ে যায়। রাণাঘাটের পালচৌধুরী বংশের আদিপুরুষ কৃষ্ণপ্রান্তি অতি সামান্য মূল্যে ঐ পোড়া গোলা কিনে নেন। কৃষ্ণপান্তির ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল, কারণ শুধু ওপরের ধানগুলোই পুড়েছিল, নীচের ধান একটাও পোড়েনি। এই ধান বিক্রী কোরে তিনি প্রচুর লাভ করেন এবং সেই থেকেই ঐশ্বর্য্যলক্ষী যেন তাঁর ঘরে এসে বাঁধা পড়েন। কৃষ্ণপান্তির পানের ব্যবসা ছিল, সে কথা উল্লেখ আছে সাধক রাম-প্রসাদের গানে—

"পান বেচে খায় কেষ্টপান্তি
ও মা তারেও দিলি জমিদারী"

যুগলকিশোর মন্দিরের পাশে আর একটি প্রাচীন মন্দিরে আছেন গোপীনাথ জীউ। প্রবাদ আছে যে, যুগলকিশোর মন্দির স্থাপনের অনেক আগেই এই বিগ্রহ এখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

সেদিনের সে আড়ংঘাটা আজ আর নেই। আজ এটি একটি বিরাট গঞ্জ। বাসরুট চলে গেছে কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, বনগাঁ পর্য্যন্ত। বড় বড় বাড়ী ঘর, স্কুল, হাসপাতাল সবই আছে।

সবার ওপর আছেন যুগলকিশোর। যাঁর কৃপাবলে চূর্ণী বয়ে চলেছে আর বয়ে চলেছে ভক্তির স্রোত মানুষের মনে।

বৃন্দাবন থেকে একা এলেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীরাধাও এলেন কিছুদিন পর। রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ দেখলো মানুষ।

এ মেলায় যদি আসতে চান, তাহলে মেলা মন নিয়ে আসবেন না। একমনে আসুন তাহলে মেলায় এসে মেলা জিনিষের সাথে এমন জিনিষ মিলে যেতে পারে, যা কখনও আপনি অর্থ দিয়েও মেলাতে পারতেন না। তা হচ্ছে যুগল-কিশোরের কৃপা।

* * * *

আরেক মেলা দেখতে চলুন এই মাসেই চূর্ণী নদীর পশ্চিমপারে উলা গ্রামে।

বৈশাখী পূর্ণিমা থেকে সুরু হোয়ে এই মেলা চলে জ্যৈষ্ঠের দুই-তিন তারিখ পর্য্যন্ত। বর্ত্তমানে এর নাম বীরনগর। রাণাঘাট-কৃষ্ণনগর লাইনে কালীনারায়নপুরের পরের ষ্টেশনই বীরনগর। এর আগের নাম ছিল উলা। বিরাট উলুবন কেটে এই গ্রাম তৈরী হোয়েছিল বোলেই এর নাম উলা। খ্রীষ্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এখানে ভয়ানক ডাকাতের উপদ্রব ছিল। উলার গ্রামবাসী পরম বিক্রম ও সাহসের সঙ্গে ডাকাতের দল ঘিরে ফেলে, সবাইকে ধরে ফেলে। এই সাহসিকতার পুরস্কার হিসাবে তদানীন্তন সরকার এ গ্রামের নাম "বীরনগর" বোলে ঘোষণা করেন। এ গ্রাম অতীত সমৃদ্ধিতে ভরা। বড় বড় বাড়ীঘর, দীঘি, প্রাচীন গড় ও ভগ্নাবশেষ যা আজও দেখা যায় তাতে মনে হয় এ গ্রাম বিরাট বর্দ্ধিষ্ণু ছিল। বীরনগরের পুরানো খ্যাতি, কুলমর্য্যাদা এ অঞ্চলে আজও মানুষ ছড়া কোরে বোলে থাকে—

"উলার মেয়ে কুলকুহুটি
নদের মেয়ের খোঁপা
শান্তিপুরে নথ নাড়া দেয়
গুপ্তিপাড়ার চোপা।"

এখানে অনেক সংস্কৃত টোল ছিল। প্রাচীন পণ্ডিতদের মধ্যে ছিলেন চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন, কৃষ্ণরাম ন্যায়পঞ্চানন, সদাশিব তর্কালঙ্কার, শিবশিব তর্করত্ন, ভবানীচরণ ন্যায়ভূষণ, মুকুন্দমোহন ন্যায়রত্ন ও কবি দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়। এখানে আছেন বটবৃক্ষতলে উলাইচণ্ডী দেবী। দ্বাদশ মন্দির। মুস্তাফিদের জোড় বাংলো। ভক্তিবিনোদ কেদারনাথ দত্তর জন্মভিটা।

উলাইচণ্ডীর পুরোণো পূজাপদ্ধতি ছিল যে, প্রথম পূজা হাড়িজাতীয় কোন ব্যক্তি কোরবেন। তাতেই মনে হয় যে, এ মূর্তি বৌদ্ধযুগ থেকে চলে আসছে।

প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমা থেকে তিনদিন উলাইচণ্ডীর পূজা হয়, এই উপলক্ষে বিরাট মেলা বসে। এই সময় বিন্ধ্যবাসিনী ও মহিষমর্দ্দিনীর বারোয়ারী পূজাও হয়। রোগ-শান্তি ও বাসনা পূরণের জন্য আজও অনেকে উলাইচণ্ডীর বটবৃক্ষের ডালে ইট বেঁধে পুজো দিয়ে থাকে।

একসময় ভাগীরথী বীরনগর গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যেতো, বর্ত্তমান বীরনগর গ্রামের পূর্ব-দক্ষিণ পাশ দিয়ে। ডাকাতের খাল ও বারোমেসে খাল নামে যে গভীর জলাভূমি আছে, তা থেকে অনুমান হয় যে ওটাই ভাগীরথীর প্রাচীন খাত।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীগ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, শ্রীমন্ত সদাগর যখন সিংহল যাচ্ছিলেন নৌবহর নিয়ে, সেই সময় উলার নীচে গঙ্গার ঘাটে ভীষণ ঝড় ওঠায় তিনি তাঁর নৌকা নোঙর কোরে উলাইচণ্ডীর পূজা দিয়ে নৌবহর সমেত রক্ষা পেয়েছিলেন।

সেদিন তিথি ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা।

প্রায় দেড়শত বছর আগে উলা নিবাসী কবি দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় রচিত "গঙ্গা ভক্তিতরঙ্গিণী" প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে একটা মূল্যবান গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি বর্ণনা কোরেছেন—

অম্বিকা পশ্চিমপারে শান্তিপুর পূর্বধারে
রাখিয়া দক্ষিণে গুপ্তিপাড়া
উল্লাসে উলার গতি বটমূলে ভগবতী
যথায় পাতকী নহে ছাড়া।
বৈশাখেতে যাত্রা হয় লক্ষ লোক লক্ষ্য হয়
পূর্ণিমা তিথিতে পুণ্যচয়।
নৃত্যগীত নানা নট দ্বিজ করে চণ্ডীপাঠ
মনে যা মানসে সিদ্ধি হয়॥

একসময় বীরনগর গ্রাম খুবই স্বাস্থ্যকর ছিল। লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৪০ হাজার। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ম্যালেরিয়া মহামারী আকার ধারণ করে, যার ফলে সারা গ্রামটাই নষ্ট হোয়ে যায়।

তারপর ধীরে ধীরে গ্রামটা আদর্শ পল্লীতে রূপান্তরিত হয়। এ গ্রামের নবরূপ দেন নগেন মুস্তাফি। বাংলার প্রখ্যাত লেখক রাজশেখর বসুর (পরশুরাম) বাড়ী এই গ্রামে।

এই গ্রামের পাশে পালিতপাড়া গ্রামে পৌণে দু'শত বছর আগে কানাইলাল ও নীলমণি আচার্য্য নামে দুই সহোদর ভাই বাংলাদেশে প্রথম দেবীপ্রতিমার ডাকের সাজের উদ্ভাবন করেন।

আজও ঝড় ওঠে বৈশাখ মাসে।

কোন শ্রীমন্ত সদাগর আজ আর পথ ভুলেও এ পথে আসেন না।

কিন্তু উলাইচণ্ডীর পূজা ঠিকই হয়।

সব অনিত্য বস্তুর মাঝে উনিই যে একমাত্র নিত্যবস্তু।

শিবনিবাসের ভৈমী একাদশীর মেলা

"শিবনিবাশী তুল্য কাশী ধন্য নদী কঙ্কণা,
উপরে বাজে দেব-ঘড়ি নীচে বাজে ঠন্‌ঠনা।"

ছোট্ট নদী। নাম কঙ্কণা—হেঁটেই পার হওয়া যায়। শির্‌-শির্‌ করে জলের ধারা বয়ে চলেছে। এই নদীর পাড়ের ওপর শিবনিবাস গ্রাম। লোকে বলে —কাশীধামও যা, শিবনিবাসও তাই। একই পুণ্য সঞ্চয় দুই জায়গায়।

সে কঙ্কণা আর নেই, তার সে স্রোতও আজ আর বয় না। গ্রাম আছে শিবনিবাস, আর আছে তিনটি মন্দির। একটা রাম-সীতার, আর দু'টি শিবের।

প্রতি বছর শিব-চতুর্দ্দশী, চড়ক আর ভৈমী-একাদশীর দিনে দেশ-দেশান্তর থেকে মানুষ আসে পূজা দিতে। মন্দিরের চারপাশ ঘিরে বিরাট মেলা বসে।

মেলা বসে মানুষের মেলা। সব রকম মানুষ যেখানে মেলে, সেখানেই বসে মেলা। তরি-তরকারী থেকে শুরু করে খেলনা, সব কিছুই পাওয়া যায়। শাক আলু আসে গরুর গাড়ী ভর্তি হয়ে—লোহার বালা আর সিন্দুরের দোকান শুরু হয় স্নানের ঘাট থেকে। স্নান করে উঠতে না উঠতেই সিন্দুর কেনার হিড়িক পড়ে যায়।

এ মেলার প্রচলিত নাম শিবনিবাসের হরি-সভার মেলা, আবার কেউ বা বলে শিব-চতুর্দ্দশীর মেলা, রাম-সীতার মেলা। তবে বর্ত্তমানে ভীম-একাদশীর দিনই প্রচুর লোক সমাগম হয়। ট্রেনে, বাসে, নৌকায় করে চারিদিক থেকে মানুষ আসে, নদীতে স্নান করে, পূজা দেয়। এ-মেলা তিন দিন পর্য্যন্ত জমজমাট থাকে।

শিবনিবাস যেতে গেলে এমন কিছু ঝামেলা নেই বা আগে থেকে বিরাট কোন প্রস্তুতিরও প্রয়োজন নেই। পূর্ব রেলওয়ের রাণাঘাট জংশন ষ্টেশন থেকে উনিশ মাইল দূরে মাজদিয়া ষ্টেশন। ষ্টেশনে নেমেই বাস পাওয়া যাবে শিব-নিবাসের। ভাড়া মাত্র পঁচিশ পয়সা। টেম্পো আছে, রিক্সা আছে। যাতে খুশী তাতে চেপে যাওয়া যায়। মাইল দুই এসে চুর্ণী নদীর পাড়ে এসে খেয়া পার হলেই ওপারে শিবনিবাসের মন্দির। এত বড় শিবের মন্দির পশ্চিম বাংলায়

আছে বলে মনে হয় না। আগেকার জীর্ণ মন্দির সংস্কার করে দিয়েছেন শিল্পপতি বিড়লা। এখন শিবের মাথায় জল দিতে হ'লে উঁচু মই বেয়ে উঠতে হবে।

এতবড় শিবের মন্দির যে, তার চূড়া ট্রেন থেকেই দেখা যায়। এই মন্দির যদি সংস্কার না হ'ত, তাহলে আজ আর অস্তিত্ব থাকতো কিনা সন্দেহ। যাঁরা এ মন্দিরের নতুন রূপ দিয়েছেন, দেশবাসী তাঁদের কাছে অবশ্যই চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন।

আজও আমার দেশে কত শত প্রাচীন মন্দির ও দেববিগ্রহ সংস্কারের অভাবে চিরকালের জন্য লুপ্ত হ'য়ে যাচ্ছে, তা কে জানে। বাংলার গ্রামীণ সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্পন্দন এইসব মন্দির। এইসব মেলার ভিতর ছড়িয়ে আছে—এসব লুপ্ত হ'য়ে গেলে দেশের বিরাট সম্পদ চলে যাবে। মন্দিরের দেশ বাংলা। দেবতার লীলাভূমি এই বাংলায়। এ মাটি চির পবিত্র। রাজ্য সরকারের কত লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় হ'য়ে যাচ্ছে। তারই কিছুটা যদি এইসব গ্রামীণ দেব-মন্দির সংস্কারের জন্য ব্যয় হ'ত, তাহ'লে ঘুমন্ত দেবতা হয়তো আবার জাগ্রত হ'তেন। কিন্তু অপচয়ের খাতায় যাদের লক্ষ লক্ষ টাকার হিসাব লেখা হচ্ছে, তাঁরা এসব দিকে লক্ষ্য রাখবেন কি ক'রে?

ধূলো ছড়ানো পথের দু'পাশ দিয়ে দোকানীরা পশরা সাজিয়ে নিয়ে বসে আছে। মানুষের কোলাহল, মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি, মেয়েদের উলুধ্বনি—সব মিলিয়ে এক অপরূপ পরিবেশ। মন্দিরের ভিতরে ঐ যে দেবাদিদেব ধ্যানমগ্ন হয়ে আছেন। পাশের মন্দিরে রামসীতা দাঁড়িয়ে আছেন। মনে হচ্ছে, ওঁরাই বুঝি টেনে এনেছেন এইসব হাজার হাজার মানুষকে।

দেবতার আকর্ষণেই তো মানুষ আসে। তিনি তো সবাইকেই ডাকেন। আপনি, আমি না ডাকতে পারি, কিন্তু তিনি তো বসে নেই, তিনি ঠিকই ডাকছেন। কান পেতে যে এক মন নিয়ে থাকে, সে ঠিকই শুনতে পায়।

এবার শুনুন এই মেলা আর মন্দিরের কথা। নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ১৬৭৬ শকাব্দে এই তিনটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর আমল থেকেই এই মেলার প্রবর্তন। শিবচতুর্দ্দশীর দিন এই মেলা বসতো। সার্কাস আসত, পুতুল খেলা আসত। তারপর চড়কের দিনে ও ভীম একাদশীতেও পুজা সাজিয়ে সবাই নিয়ে আসা সুরু ক'রল। সেই থেকেই এই তিন তিথিতেই মানুষ এসে পুজো দিচ্ছে। অবশ্য শিবের নিত্য পূজা হয়। সেবাইৎ আছেন।

জনশ্রুতি আছে যে, মহাদেব কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে স্বপ্নাদেশ দেন যে তিনি কাশী ছেড়ে শিবনিবাসে এসেছেন—সেখানেই যেন তাঁকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই স্বপ্নাদেশ পেয়েই মহারাজা এই তিনটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কেউ বা বলেন নশরৎ খাঁ নামক এক দস্যুকে দমন করবার জন্যই তিনি শিবনিবাসে আসেন এবং দস্যু দমন করার পর এক রাত্রি সেখানে বাস করেন।

রাত ভোর হয়। পূর্বদিক রাঙা হ'য়ে ওঠে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নদীতে হাত মুখ ধুতে নামেন। এমন সময় একটা রুই মাছ এসে তাঁর সামনে ঘন ঘন লেজ ঝাপটাতে থাকে। মাছের ভাষা মহারাজা কি বুঝলেন। এমন সময় কৃপাময় রায় নামক একজন রাজারই জ্ঞাতি তাঁকে শিবনিবাসে বাস করতে বলেন। তখন দেশ জুড়ে বর্গীর উৎপাত চলছে। দেশের মানুষের মনে কোন সুখ-শান্তি নেই। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কঙ্কণা নদীকে কঙ্কণাকারে ঘিরে ফেলে তার মাঝে এক প্রাসাদ তৈরী করলেন।

আজকের শিবনিবাসকে সে সময় সবাই কাশীর তুল্যই মনে ক'রত। মানুষের ভক্তিই আসল। ভক্তি থাকলে শিবনিবাসই কাশীধাম হ'তে পারে। মানুষের সব কিছু শেষ হ'য়ে যায়, কিন্তু ভক্তির ভাণ্ডার কখনও নিঃশেষ হয় না —সেই দেবদেবতাও মানুষের মাঝে এসে মেলেন, মেলা বসান।

সন্ধ্যার পর শিবনিবাসের মেলা এক বিচিত্র সাজে সজ্জিত হয়। চারপাশে বৃক্ষলতা, বড় বড় গাছ, তার মাঝে মেলার দোকানে মোমবাতি জ্বলে, প্রদীপ জ্বলে, দু'চারটে গ্যাসবাতিও জ্বলে ওঠে। দূর থেকে মনে হয় যেন জোনাকীর মেলা বসেছে এ অঞ্চল ঘিরে।

গ্রামের রামায়ণের দল এসে চামর দুলিয়ে রামসীতার মন্দিরের সামনে রামলীলা গান করেন। সে সব দিন আজ আর নেই—সে কঙ্কণা নদী বহুকাল আগেই হারিয়ে গেছে, এখন বয়ে চলেছে চূর্ণী নদী। মাজদিয়া ষ্টেশনের দক্ষিণ পশ্চিমে মাথাভাঙা নদী। চূর্ণী আর ইছামতী এই দুই নামে বয়ে চলেছে দুদিক দিয়ে। আবার চূর্ণী এসে মিশেছে পায়রাডাঙার কাছে গৌর নগরের গঙ্গায়।

যে সময়কার কথা বলছি' সে সময় অনেক মানুষ পাল-পার্ব্বণে এই গৌরনগরে আসতো গঙ্গাস্নান ক'রতে। অবশ্য আজও যে আসে না তা নয়, তবে সংখ্যায় অল্প।

শিবনিবাসের মেলা ও মন্দির সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু তথ্য জানা যায়

'নদীয়া কাহিনী' 'নদীয়া গেজেট' ও রাজীব লোচনের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র' ও 'রায়স্য চরিত্রম্' গ্রন্থে।

মেলা থেকে ফিরে এসে মাজদিয়া ষ্টেশনে যদি ফেরার ট্রেন না মেলে দু'তিন ঘণ্টার ভিতর, তাহলে বাজারের রাস্তায় নেমে কিছুদূরে গিয়ে একটা নীচের রাস্তা ধরে সোজা চলে যাওয়া যায় ভাজনঘাটের দিকে। মাইল দেড়েক দূরে এই গ্রাম। এই ভাজনঘাট গ্রামে 'রাই উন্মাদিনী' 'স্বপ্নবিলাস' ও 'বিচিত্রবিলাপ' গ্রন্থ প্রণেতা কবি কৃষ্ণকমল গোস্বামীর জন্ম হয়। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পর এতবড় উচ্চশ্রেণীর পদকর্তার আর জন্ম হয় নি। নবম ও দশম শ্রেণীতে যে বিখ্যাত এম. সেনের নোট পড়ানো হয়, সেই এম. সেনের বাড়ীও এই গ্রামে। মাতৃসাধক কবি রামপ্রসাদের সহধর্মিনী সর্বাণীও এই গ্রামেরই মেয়ে ছিলেন।

মাজদিয়া ষ্টেশনের দু' তিন মাইল পশ্চিমে নাথপুর গ্রামে কর্ণেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস জন্মগ্রহণ করেন। এই ষ্টেশনের পরের ষ্টেশন কানপুর। ষ্টেশনের পাশে মাটিয়ারী গ্রামে নদীয়া রাজবংশের প্রথম রাজধানী ছিল। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দের পৌত্র রাঘব রায়। ভবানন্দের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখনও মাটিয়ারী গ্রামে দেখা যায়। ষ্টেশনের দক্ষিণে ইছামতীর ওপারে মাইল দেড়েক গেলে ঘ'টুরা গাজনা গ্রাম। এই গ্রামে সাধিকা ব্রহ্মবাদিনী মা সাধনা ক'রে সিদ্ধিলাভ করেন। এখানে তপোবনের মত একটি আশ্রম আছে।

এবার মনে হচ্ছে যেন ট্রেন আসছে। সিগন্যাল সবুজ দেখা যাচ্ছে। থামলে তো চলবে না—আমাদের এগুতেই হবে। জানিয়ে দিচ্ছে ঐ সবুজ আলোর সঙ্কেত।

———

মাটিয়ারীর অম্বুবাচীর মেলা

রাজার নাম ভবানন্দ মজুমদার।

রাজধানীর নাম মাটিয়ারী।

এক নজরে মনে হবে যেমন রাজা তেমন তাঁর রাজধানী। এ আবার কেমন নাম। কোন যাত্রা দলের কাল্পনিক নাটকের রাজা ও রাজধানী হবে হয় তো।

বর্ত্তমান যুগে এসব নাম তো অচল।

সচল হোত যদি নাম থাকতো রাজা কংসনারায়ণ বা রাজা বীরমল্ল। সচল হোত যদি রাজধানীর নাম হোত দীঘাপাতিয়া বা স্বর্ণপুর।

কিন্তু বললেই তো হবে না—

ইতিহাস—ইতিহাসই।

তা যত বছরের পুরনোই হোক, আর তার পাতা যতই ছিঁড়ে যাক। ইতিহাস কখনও মিথ্যা কথা বলে না।

ভবানন্দ মজুমদার আজ নেই, কিন্তু তাঁর রাজধানী মাটিয়ারী আজও আছে—আরও আছে বিশাল প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ, জঙ্গলের ভেতরে ভাঙা ইটের স্তূপ, উঁচু উঁচু অজস্র ঢিবি আর লম্বা লম্বা পরিখা—সবই আজ ভাঁট গাছ, আশশ্যাওড়া আর নানান রকম বনঝোপে ঢেকে গেছে। বনঝোপ আর গাছ-গাছালিতে কি আর ইতিহাস চাপা পড়ে? না—পড়ে না।

কলকাতা থেকে বানপুর গেদে লাইনে ৬৮ মাইল দূরে বানপুর রেল ষ্টেশন। বানপুর ষ্টেশন পার হয়ে ডানপাশে বাজার ছাড়িয়ে প্রায় এক মাইল গেলেই সেকালের রাজধানী আর আজকের মাটিয়ারী গ্রাম। কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রথম রাজধানী ছিল এই মাটিয়ারী গ্রাম। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদার—তাঁর পৌত্র রাঘব মাটিয়ারী থেকে কৃষ্ণনগরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

ঠিক যেমন উড়িষ্যার রাজধানী চলে গেল কটক থেকে ভুবনেশ্বরে। পাকিস্তানের রাজধানী রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ইসলামাবাদ। রাজধানী এসব জায়গা থেকে সরে গেলেও আর সব ঠিকই আছে। কিন্তু মাটিয়ারী আর আগের মতন নেই। সবই প্রায় বনজঙ্গলে ভরা। দেশ বিভাগের কল্যাণে ওপার বাংলা

থেকে এপারে এসেছে অনেক মানুষ। তারা এসে নতুন করে সংসার পেতেছে। মাটিয়ারীতে এসে মনে হয়, রাজা নেই, রাজধানী নেই: কিন্তু মানুষ আছে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে। আজও মাটিয়ারীর ঐ উঁচু ঢিবিগুলোর দিকে চেয়ে সবাই বলে—ঐ তো ভবানন্দের ঢিবি।

জঙ্গলের ধারে গিয়ে দাঁড়ালে মনে হয় বিরাট এক কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অপমৃত্যু ঘটেছে এই মাটিতে কয়েক শ বছর আগে। কেউ কেউ বলেন ভবানন্দ মজুমদারই কাশীর অন্নপূর্ণার মন্দির তৈরী করেছিলেন।

এ সম্বন্ধে সঠিক বিশেষ কিছু জানা যায় না।

মাটিয়ারীতে পীর মল্লিক গস্ নামে একজন মুসলমান সাধু ছিলেন। জাতে মুসলমান হলেও অনেক হিন্দুও তাঁর শিষ্য ছিল। পীর সাহেব আধ্যাত্মিক জগতের একজন সর্বজ্ঞ ছিলেন—ঈশ্বর তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল অসাধারণ। তাঁর কথা শোনবার জন্য নিত্যই মানুষের আনাগোনা ছিল।

সৎসঙ্গ, সৎকথা ঈশ্বরের কাছে পৌছানর দুটো সিঁড়ি, এই সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারলেই হোল।

দেবদেবতার জাত নেই, সাধু পয়গম্বরেরও জাত নেই। তাঁদের কাছে সব একাকার।

একাকার মন না হলে তো মানুষকে আপন করা যাবে না।

শুধু মাটিয়ারী নয় তামাম ভারতবর্ষেরই ঐ এক কথা।

পীর মল্লিক গসের সমাধি আজও আছে মাটিয়ারীতে।

প্রতি বছর অম্বুবাচীতে পীরের মৃত্যু তিথি উপলক্ষে এক বিরাট মেলা বসে। চারদিন মেলা থাকে।

সমাধি পীর সাহেবের অথচ মেলা হয় অম্বুবাচীতে, ভারী আশ্চর্য ব্যাপার মনে হয়! অম্বুবাচীতেই তিনি দেহত্যাগ করেছিলেন বলেই সেই উপলক্ষে মেলা ও জনসমাগম হয়।

মেলাতে সব জায়গার মানুষই আসে। আসে হিন্দু, আসে মুসলমান। আসে সকল স্তরের মানুষই।

মেলার একপাশ দিয়ে রাস্তা চলে গেছে পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে ফুলবাড়ীর দিকে। সরকারী চোখকে ফাঁকি দিয়ে বিনা পাশপোর্টেই ওপার বাংলার মানুষও আসে।

সাধুসন্ত পয়গম্বর দর্শনে আসবে তার আবার পাশপোর্ট কি? শ্রদ্ধা আর

ভক্তি। এই তো পাশপোর্ট আর ভিসা। আর কি চাই।

গরুর গাড়ীতে শাড়ী টাঙিয়ে পর্দা বানিয়ে আসে আশেপাশের গ্রামের বিস্তর মুসলমান পরিবার। সঙ্গে নিয়ে আসে অজস্র মুরগী। মনে হয় যেন সবাই ছোটখাটো একটা পোলট্রি সাথে করে এনেছে এখানে কদিনের মত তারা সংসার পাতে, মেলায় ঘোরে, সওদা করে। বিনা পয়সায় সরকারী সিনেমা দেখে পীরের সমাধিতে পূজো দেয় আবার চলে যায়।

মেলায় আসে মাদুর, লাঙলের ঈশ, মাটির হাঁড়ি-কলসীর দোকান। তরীতরকারীও বিক্রী হয়। খাবারের দোকানও আসে। রাতে কেরোসিনের লম্প জলে, হ্যারিকেনও জলে, আবার কেউ কেউ হ্যাসাগ বাতী ও জালে।

বেচাকেনা চলে দিনরাত। কাছের মানুষ চলে যায় দূরের মানুষ আশ্রয় নেয় কারও বাড়ীর বারান্দায় বা কারও উঠানে।

পীর মল্লিক গস্ সমাধির ভেতর থেকে সবাইকে পাহারা দেন।

আরও কিছুদূর এগিয়ে গেলে পশ্চিমবাংলার সীমান্ত ষ্টেশন গেদে। গেদের প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে দূরে আবছা দেখা যায় দর্শনা ষ্টেশন। পরিষ্কার-ভাবে দেখা যায় কেরু কোম্পানীর চিনি কলের বিরাট চিমনিটা।

গেদে থেকে সোজা লাইন চলে গেছে বাংলা দেশে, মালগাড়ী চলাচল করে।

মাটিয়ারীর পাশ দিয়ে আর একটা রাস্তা চলে গেছে খালবোয়ালিয়ার দিকে। বিরাট বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম।

আরও কিছুদূরে নাথপুর গ্রামে বাংলার এক দামাল ছেলে কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসের জন্মভিটে।

আজ কত বছর কেটে গেছে। ভবানন্দ মজুমদারও নেই আর তার রাজ-ধানীও নেই।

আছে গ্রাম মাটিয়ারী।

কবিকঙ্কন চণ্ডীতে শ্রীমন্ত সদাগরের সিংহল যাত্রা কথার মধ্যে মাটিয়ারী গ্রামের নাম পাওয়া যায়।

———

চাপড়ার ভগবান যীশুর বড়দিন উৎসব ও মেলা

"It is easier for a camel to enter into the eye of a needle than to a richman to enter into the kingdom of God."

—Jesus Christ.

এ সংসারে সুখী কে?

যার অর্থ আছে, যার প্রচুর সম্পত্তি আছে, যার হুকুমে মানুষ ওঠে বসে—সেই তো সুখী। তার তো কোন অভাব নেই, সুন্দরভাবে বাঁচতে হলে যা যা প্রয়োজন, সবই তার আছে—তাহলে তার মত সুখী আর কেউ নেই।

কিন্তু সত্যিই কি তাই!

তা যদি হ'ত তাহলে ধনী ও বিত্তমান মানুষ আত্মহত্যা করে কেন? কেন তার চোখে ঘুম নেই, কেন সে মনমরা হয়ে থাকে!

কারণ একটাই, তার মনে কোন সুখ নেই।

বড় অসহায়, বড় দরিদ্র সে! কেন সে দরিদ্র? ঈশ্বর ধনে সে তো ধনী নয়, তাই সে অসুখী।

অন্নবস্ত্র, বাড়ীঘর থকলেই মানুষ যে সুখে থাকছে—এ কথা জোর করে বলা যায় না।

সুখী সেই—যে ঈশ্বর অনুসন্ধানী।

ধন অনুসন্ধানীর মত গরীব আর কেউ নেই।

কারণ ঈশ্বর ছিলেন, আছেন, থাকবেন।

আর ধনদৌলত—কাল ছিল, আজ আছে, আগামীকাল থাকবে না।

যা থাকবে না, তাকে যারা ধরে রাখতে চায়—তাদের মত দরিদ্র অসহায় আর কেউ নেই।

ভগবান যীশু বললেন—একটা শৃগাল, তারও আশ্রয় আছে; কিন্তু মানুষের কোন আশ্রয় নেই, সে বড় অসহায়।

আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে তিনি এসেছিলেন—মানুষের মাঝে, মানুষকে ত্রাণ করবার জন্য। মানুষের মনের ময়লা দূর করে দিয়ে পরিত্রাতা রূপে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

তাঁর কথা, তাঁর উপদেশ—মানুষ কি করে ভুলবে ?

কেন না. ভুললেই তো তার মহামরণ হ'ল।

পৌষ মাসের বড়দিন তাই পৃথিবীর মানুষের কাছে এক স্বর্ণময় দিন। মানুষের মুক্তির এক মহালগ্নফল।

ভগবান ত্রাণ করতে ধরাধামে এসেছিলেন।

দরিদ্রের ভগবানের কি অপার করুণা।

সকল নিরাশ্রয় মানুষের যেন আশ্রয় মিলল।

তিনি বললেন—প্রত্যেক মানুষের কাঁধে দুটো থলি আছে। একটা সামনে, একটা পিছনে। অপরের দোষগুলো সে সামনের থলিতে ও নিজের দোষগুলি পিছনের থলিতে রাখে।

এর মানে কি ?

মানুষ নিজের দোষ ধরতে চায় না, পারেও না অপরের দোষ ধরেই তার দিন কাটে। নিজের দোষ ধরা যে বড় শক্ত কাজ।

এ-তে তাকে পাওয়া যাবে না।

মনের ময়লা পরিষ্কার না হলে তিনি তো হৃদয় সিংহাসনে বসবেন না। অন্তরের দেওয়ালে ভক্তি ও শ্রদ্ধার চুণ, বালি দিয়ে তবেই তো তাঁকে ডাকতে হ'বে।

প্রভু যীশু মানুষের ত্রাণকর্ত্তা, মানুষেব মুক্তিদাতা, তাঁকে যে খোঁজে, সে নিশ্চয়ই তাঁকে পায়।

যদি যেতে চান সেই ত্রান কর্ত্তার কাছে, তাহলে চলুন যাই চাপড়ার গীর্জায় —বড়দিনের উৎসবে। সারাদিন কোথা দিয়ে যে কেটে যাবে টেরই পাবেন না।

কৃষ্ণনগর ষ্টেশন থেকে বাস বা টেম্পোতে মাইল দশ-এগারো হ'বে। বাস চাপড়ায় ঢুকতেই ডান পাশে পড়বে গীর্জা।

নেমে পড়ুন। সামনে দেখবেন, আলো ঝলমল করা গীর্জা। ধনী, দরিদ্র উঁচু, নীচ—সবই যেন আজ একাকার। সবার মুখে সেই একই প্রার্থনার সুর প্রভু যীশু আমাদের ত্রান করার জন্ম পৃথিবীতে এসেছিলেন—বড় দয়াল তিনি।

কতরকমের সাজসজ্জা সবার। যার যা আছে তাই পরে আজ এসেছে আনন্দের হাটে। আজ কারও দেহে, মনে কোন মালিন্য নেই। সারা অঙ্গন, প্রাঙ্গন আলোয় আলোময়। এখানকার মেলা মানুষের মেলা। মানুষে মানুষে কোলাকুলি। মানুষে মানুষে জানাজানি, হৃদয় দিয়ে হৃদয় পাওয়া। ভালবাসা দিয়ে ভালবাসা নেওয়া। কেউ আজ পর নয়, সবাই আপন।

এর মাঝেই তো প্রভু যীশুর আবির্ভাব।

এখানকার ধূলায আজ যীশুর পদরেণু। এখানকার বাতাসে আজ যীশুর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস।

তিনি যে সত্যিই এসেছেন।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনিই এসেছেন।

ঐ তো তিনি বলছেন : আমাকে শুধু প্রভু বলে ডাকলেই হবে না, আমি যা বলি তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হ'বে, তবেই আমি তোমাদের কাছে থাকব।

ঐ শোন কান পেতে—

তিনি বলছেন : নিজেরা সতর্ক হও। তোমাদের হৃদয় ভোগলিপ্সায় যেন মত্ত থাকে না—অসতর্ক হলেই তোমাদের আক্রমণ করবে। মরণ ঘুমে ঘুমিও না, জেগে থাক। জেগে না থাকলে সৎ জিনিসের সন্ধান পাবে না।

সৎ জিনিস কি ?

ঈশ্বর ! তিনি ছাড়া সৎ কিছুই নেই।

চাপড়ায় কেক, বিস্কুটের দোকানে আজ মানুষের ভীড়। মিষ্টির দোকানে রঙ-বেরঙী মিষ্টি—নিরানন্দময় জীবনে আজ যে পরম আনন্দের দিন।

চাপড়া থেকে আরও কিছুদূরে মালিয়াপোতা গ্রাম। বাস ষ্টপেজ থেকে নেমে ডানদিকের কাঁচা রাস্তা ধরে চলে গেলে পাশাপাশি দুটো গীর্জ্জা। সেখানেও বড়দিনের জমজমাট উৎসব, কীর্ত্তনের ছড়াছড়ি।

রাণাঘাটের কাছে শান্তিপুর লাইনে হবিবপুর ষ্টেশনের কাছে গীর্জ্জাতেও মহা ধুমধাম।

রাণাঘাটের কাছে বেনেপাড়ার গীর্জ্জাতেই হয় সবচেয়ে বড় উৎসব ও মেলা। বিরাট গীর্জ্জাটা আলো দিয়ে সাজানো হয়। ভিতরেও অপরূপ সাজে সজ্জিত

করা হয়। সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত আশপাশের দশ পনেরো হাজার মানুষ এসে জড়ো হয়। গীর্জ্জার একপাশে গোশালা তৈরী হয়। সেখানে ইলেকট্রিকের সাহায্যে যীশুর বাল্যলীলা দেখানো হয় আর একপাশে খেলনা ট্রেনের যাতায়াত দেখানো হয় বিদ্যুতের সাহায্য নিয়ে। সারা মাঠ বেলুনে বেলুনময় হয়ে যায়। জাতীয় সড়কের দুপাশ দিয়ে দোকানীরা পশরা সাজিয়ে বসে।

সন্ধ্যার পর বাড়ী বাড়ী চলে খাওয়া-দাওয়ার হুল্লোড়।

আজকের দিন যে বড় পুণ্য দিন।

আজ আশ্রয়দাতা যীশু যে সবাইকে আশ্রয় দিয়েছেন।

মুড়াগাছার মা সর্বমঙ্গলা

পথ এমন বেশি কিছু দূর নয়। পূর্ব-রেলওয়ের মুড়াগাছ রেল ষ্টেশন। ষ্টেশনের বাইরে রিক্সা মেলে, তারই একটায় চেপে সোজা মুড়াগাছা বাজার। বেশ খানিকটা পীচের রাস্তা। গ্রামে ঢোকার মুখেই শুরু ইঁট-পাতা পাকা রাস্তা। মাইলখানেক পথ হবে মনে হয়। দু'পাশে মাঠ। মাঝে মাঝে আম কাঁঠালের বাগান। সোজা গিয়ে নামলাম মুড়াগাছা বাজারে। রিক্সার ভাড়া এক টাকা। সকালবেলায় দেখলাম বাজার বসেছে। নানান রকম তরি-তরকারি, চাল, আলু নিয়ে বসেছে দোকানীরা।

সামনেই একটা ভগ্নপ্রায় নাট-মন্দির। সেখানে নানান রকম খেলনার দোকান। কদমা বাতাসার ছোট ছোট দোকান। বেশ ছোটখাট একটা মেলাই বসেছে। নাট-মন্দিরের পাশেই মা সর্বমঙ্গলার মন্দির। ১৫০ বছরের পুরানো মন্দির। এখানে-ওখানে ভেঙ্গে পড়েছে। মন্দির চত্বরে রাশি রাশি ধুলোর স্তূপ। মনে হল এই মন্দিরের প্রতিকারেও যেন দৃষ্টি নেই। এর মাঝেই মা সিংহবাহিনীরূপে দণ্ডায়মানা। বৈশাখী সংক্রান্তি থেকে পূজা সুরু হয়, চলে জ্যৈষ্ঠের তিন-চার তারিখ পর্যন্ত। নিত্য পূজা হয় সারা বৎসর ধরে। একজন পুরোহিত নিযুক্ত আছেন। মা সর্বমঙ্গলার পাশেই তিনটি মন্দির শিবমূর্তি দেখে কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করলাম তিনটি শিব কেন ?

মন্দির চত্বরে দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, সন্তোষজনক জবাব কারও কাছে পেলাম না। আশ্চর্য লাগছে এই ভেবে যে, যে মুড়াগাছা গ্রামে আজ দেড়শো বছর ধরে এই পুজা চলে আসছে। যে গ্রামে বিরাট মেলা বসতো, যেখানে পুজোর সময় কত মেষ বলি হয়েছে আর আজকের মানুষ সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানে না।

প্রদীপের নীচেই অন্ধকার। মানুষের জীবনে আজ নাকি সময়ের বড় অভাব। সংসার প্রতিপালন আছে, বিষয়-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ আছে। মামলা-মকদ্দমা আছে। হিংসা-দ্বেষের সংসারে নিত্যস্নান আছে। মা সর্বমঙ্গলার চিন্তা করবার সময় তো মেলে না। তাই আজ আমার দেশের দূর-দূরান্তে, ছায়া-ঢাকা, পাখী-ডাকা, কোন নদীর ধারে অথবা কোন অজ-পল্লীর বট অশ্বত্থের

তলায় এমনিভাবে কত মা-সর্বমঙ্গলার পূজা হচ্ছে, হয়তো ভক্তিভাবে হয়তো অবহেলিতভাবে কে তার হিসাব রাখে।

মা সর্বমঙ্গলা আছেন, তিনি ছিলেন, থাকবেন। থাকবো না আমরা—একদিন সবাই আমরা পাকা ফলের মত টুপ করে পড়ে যাবো। সেদিন কি মনে হবে কি করতে এসেছিলাম আর কি করে চলে গেলাম।

চমকে উঠলাম গান শুনে? দেখলাম মন্দিরের সিঁড়ির ধারে বসে একজন বৃদ্ধ করতাল বাজিয়ে গান গাইছে।

"মা বলে ডাকিস নারে মন
মাকে কোথা পাবি ভাই।
থাকলে এসে দিত দেখা,
সর্বনাশী বেঁচে নাই।
গিয়ে বিমাতার তীরে।
কুশ পুতুল দাহন করে।
ওগো অশৌচান্তে পিণ্ড দিয়ে
কালাশৌচে কাশী যাই।

সিঁড়ি বেয়ে নীচেয় নেবে পথে পা বাড়ালাম। বাজার ছাড়িয়ে সামনেই দেবদাস মুখুজ্যের দানবাড়ী। তৎকালে উনি নবাবের নিমক মহলের দেওয়ান ছিলেন, সেই থেকে সবাই দেওয়ান বাড়ী না বলে দানবাড়ী বলে।

এই দেবদাস মুখুজ্যেই আনুমানিক দেড়শো বছর আগে মুড়াগাছাতে মা-সর্বমঙ্গলার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। দানবাড়ীর নহবতখানা এখনও আছে। বড় বড় হাতী মায়ের পূজোর সময় এই নহবতখানার নীচে দিয়ে চলাফেরা করত। তৎকালে দেবীদাস মুখুজ্যের বাড়ী ছিল বড় বড় শিকারীদের আড্ডা। মুখুজ্যেবাড়ীর এক শিকারি ফণী মুখুজ্যে মস্ত শিকারী ছিলেন। তিনি যে কত বাঘ ও বুনোশুয়োর শিকার করেছেন তার কোন হিসাব নেই। তাঁর শিকার সম্বন্ধে নানা গল্প শোনা যায়।

একবার শীতকালে শেষরাতে আবছা অলো থাকতে নীচ-জাতীয় একজন ঝোপের আড়ালে বসে প্রাতঃকৃত্য করছিল। এমন সময় কয়েকজন গ্রামবাসী এসে জানায় যে বুনোশুয়োর এসেছে গ্রামে। শিকারী ফণী মুখুজ্যের লক্ষ্য কখনও ব্যর্থ হয়নি। এক গুলিতেই তিনি মানষটিকে মাটিতে শুইয়ে দিলেন। মৃত লোকটির আত্মীয়স্বজন মৃতদেহ ও শিকারীকে ধরে আনে কৃষ্ণনগরে নদীয়ার

জেলা শাসকের কাছে। শিকারী অনুতপ্ত, যত টাকা লাগে ক্ষতিপূরণ দিতে চাইলেন। জেলাশাসক চিন্তা করে দেখলেন যে এত বড় শিকারীকে দণ্ড দিলে মৃত্যুদণ্ডই দিতে হয়। কিন্তু একে বাঁচিয়ে রাখলে দেশের ও দশের অনেক উপকার হবে। তাই তিনি সব আপোষে মিটিয়ে দিয়ে বললেন শিকারীকে—তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে। উত্তীর্ণ হতে পারলে ছাড়া পাবে।

সেই সময়ে খড়ে-নদী আজকের মতো এত বড় ছিল না। শিকারীকে বন্দুক নিয়ে ওপারে যেতে বলা হল, আর এপারে নদীর পারে একটা খুঁটি পুঁতে তার মাথায় আগেকার একটা দুয়ানী আঠা দিয়ে আটকে দেওয়া হল।

ওপার থেকে গুলি করে খুঁটিতে রাখা ঐ দুয়ানীটি ফেলে দিতে হবে।

শিকারী ফণী মুখুজ্যে ওপার থেকে গুলি করে এপারের দুয়ানী ফেলে দিলেন। তিনি ছাড়া পেলেন।

গ্রাম থেকে আড়াই মাইল দূরে গুড়গুড়ে নদী। এখানেই রুকুনপুরের ঘাটে এসে বাসুদেব আগে মুর্শিদাবাদ থেকে ফেরার পথে নৌকা ভিড়িয়েছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। মা দুর্গার পূজা করে অঞ্জলি দেবেন এই ছিল তাঁর মনের বাসনা, কিন্তু সেদিন ছিল বিজয়া দশমী। মহারাজ মায়ের পূজা দিতে না পেরে এই রুকুন-পুরের ঘাটে বসে দুঃখিত মনে রাত কাটিয়েছিলেন। সেই রাতেই মা তাঁকে স্বপ্নাদেশ দিয়েছিলেন। সামনের জগদ্ধাত্রী পূজোতে অঞ্জলি পূজা দিলেই সব আশা পূরণ হবে।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণনগরে সেই থেকে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন করেন।

মুড়াগাছা ষ্টেশনের উত্তর দিকে মাইল তিনেক গেলে শালিগ্রাম নামে এক বহু পুরানো গ্রাম বিদ্যমান। রাজা শালিবাহন এখানে বসবাস করতেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ১০৮টি শিবমন্দির আজও ভগ্ন অবস্থায় দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেছে।

মুড়াগাছার পূর্বদিকে ধর্মদার ওপাশে প্রায় মাইল তিনেক দূরে কাঁচকুলি গ্রাম। এই গ্রামে প্রখ্যাত তারকনাথ তর্কবাচস্পতি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বানভট্টের সংস্কৃত কাদম্বরীর বাংলা অনুবাদ করেন। তিনি 'রসকড়া' "ব্যাকরণ বিভীষিকা", "অহঙ্কারের হুঙ্কার" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে যশস্বী হন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাচস্পতি মহাশয়ের পরম সুহৃদ ছিলেন। ১৯৬৪ সালে জগৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বহিস্পটতে যখন মুড়াগাছা উচ্চ-বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্কুলের উদ্বোধন করেছিলেন।

কাঁচকুলিতে আরও একজন প্রখ্যাত অধ্যাপকের জন্ম হয়েছিল। তিনি ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফেরার পথে মা-সর্বমঙ্গলাকে আর একবার প্রণাম করে মুড়াগাছার ছানার জিলাপী দিয়ে জলযোগ করে রিক্সায় উঠলাম। বহুদূরে দেখলাম সিগনালে নীল আলো জলছে, ট্রেন আসার আর দেরী নেই। মনে মনে মা সর্বমঙ্গলাকে জানালাম—

মাগো, ঐ নীল আলোটা এ জীবনে যেন জালিয়ে রেখো, তাহলে বুঝবো যে আমি আছি। আমাকে চলতে হবে। তোমাকে দেখতে না পাই একটু ডাকতে পারবো। সেটুকু থেকে আমাকে বঞ্চিত কর না।

মাদরালের জয়চণ্ডী মন্দিরে সপ্তম দোলের মেলা

ভুল করবেন না যেন—

মাদ্রাজও নয় মাদুরাও নয়।

মাদরাল।

ইষ্টার্ণ রেলের কাঁকিনাড়া ষ্টেশনে নেমে পুল দিয়ে ওপরে উঠে গিয়ে পুবদিকে মাইল দেড়েক গেলেই মাদরাল গ্রাম। ভাটপাড়া থেকে মাদরাল মাইল দুয়েক হয়। এই গ্রামে দাঁড়িয়ে রেল লাইন ছাড়িয়ে ওপারের জুট মিলের বড় গম্বুজটা দেখা যায়।

হেঁটেও যেতে পারেন, রিক্সাতেও যেতে পারেন। এস. ভি. রোডের ওপর দিয়ে সোজা যেতে হবে। দুপাশে বাজার—আরও কিছুদুর গেলেই দুপাশে কলোনী আর মাঝে মাঝে মাঠ। আর একটু গিয়ে বাঁদিকে বাঁক নিতে হবে। ঐ বাঁকের শেষেই মাদরালের জয়চণ্ডীর মন্দির।

পথ আর এমন কি বেশী!

ডানপাশে দোলমঞ্চের মত বাঁধানো একটা ছোট্ট মন্দির। ভিতরে কিছুই নেই। দু চারটে গাছ-গাছড়া ভিতরে বেশ বেড়ে উঠেছে। ওখানে নাকি সপ্তম দোলের দিন রাধাকৃষ্ণের মূর্তি নিয়ে এসে বসানো হয়। সামনেই জয়চণ্ডীর মন্দির আর নাটমঞ্চ। তার ওপাশে দোসতীনের পুকুর।

মন্দিরে শিকল দেওয়া। শিকল খুলে ভিতরে দেখলাম একটা শূন্যবেদী পড়ে আছে। শুনলাম ঐ সপ্তম দোলের দিন গ্রামের পুরোহিত জয়চণ্ডী প্রতিমা নিয়ে এসে আসনে বসান। তিনদিন এখানেই পূজা হয়। বাকী সারা বছর পুরোহিত তাঁর বাড়ীতেই ফুল জল দেন।

মন্দিরের মাথায় শিলালিপি থেকে জানা যায় এই মন্দিরটি ১৩৪৩ সালে ভাটপাড়ার সদ্গোপ বংশজাত জনৈক রাজকৃষ্ণ গৃহিণী কাদম্বিনী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। নাটমঞ্চের লিপি থেকে জানা যায় যে, ৺জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের স্ত্রী শরৎকুমারী দাসী ১৩৪৪ সালের ৪ঠা মাঘ এই নাটমঞ্চ তৈরী করেন।

মন্দিরের মাথায় শিলালিপিতে উল্লেখ আছে—

"প্রান্তে প্রান্তরগে শ্রীচণ্ডীকা মন্দিরং রম্যকং
কাটাঘাট্টি বিজাবজ জাত হও বালবস্থিতে প্রেয়োপূর্ণ নির্মিতং

সদগোপাঙ্কং রাজকৃষ্ণ গৃহিণী কাদম্বিনী শূনুভিঃ
শ্রীজয়চণ্ডী প্রীত্যৈ স্বত্তে শিত্রোশ ভট্টপল্লীয়ে
জ্যোতিষ, সতীশ, শিরিষচন্দ্রযুত ঘোষ দাসাখ্যৈ।"
মন্দিরটা বেশ প্রাচীন।

জয়চণ্ডীর মূর্তি একখানা প্রস্তর থেকে খোদাই করে নির্মিত হয়েছে। সপ্তম দোল থেকে তিনদিন এই মন্দির ঘিরে বেশ বড় মেলা বসে। দেশবিদেশ থেকে মানুষ আসে—দোকানপাটও আসে অনেক। ঐ ক'টা দিন সারা মাদরাল গ্রামে যেন উৎসব হয়।

এবার আসি পুরনো কথায়—

কে এই জয়চণ্ডী? কোথা থেকে তিনি এলেন, কিভাবে তিনি এখানে প্রতিষ্ঠিতা হলেন।

কোন পাঁজি-পুঁথি বা ইতিহাসে যখন লেখা নেই, তখন কিংবদন্তী, প্রবাদ বা জনশ্রুতির ওপর নির্ভর করতেই হবে।

প্রবাদ আছে যে, আড়াইশো বছর আগে এখানকার দোসতীনের পুকুরে এক জেলের জালে সোনার রথের চূড়া বেধে গিয়েছিল।

মা জয়চণ্ডী স্বপ্ন দিয়েছিলেন জেলেকে যে, তিনি জয়চণ্ডী। তাঁকে যেন এখান থেকে উদ্ধার করে মন্দির গড়ে পূজা করা হয়। আরও বলেছিলেন যে, একথা যেন প্রকাশ না করা হয়।

কিন্তু জেলে প্রকাশ করে দিয়েই দেহত্যাগ করে।

তারপর হয়তো কেউ মূর্তি উদ্ধার করে কোথাও প্রতিষ্ঠা করেন। দোসতীনের পুকুর সম্বন্ধে জানা যায় যে, এই পুকুরের পাড়ে আগে, অনেক আগে কাঁসা-পিতলের বাসন উঠতো। আগের দিন ঢাক ঢোল বাজিয়ে পুকুরে পূজা দিয়ে জানাতে হোত যে আগামীকাল মেয়ের বিয়ে বা পূজা আছে—এই এই বাসন দরকার সব তুমি দিও। কাজ মিটে গেলে আবার সব জলে ডুবিয়ে ফেরৎ দেবো।

কাজে-কর্মে যে মানত করত সেই নাকি বাসন পেতো।

একবার কে একজন নাকি একটা পাথরবাটি লুকিয়ে রেখেছিল। সেই থেকে বাসন ওঠা বন্ধ হয়ে গেছে।

এখনকার দিনে এসব শুনলে হয়তো বিশ্বাস হবে না। কিন্তু একথা আমি মাদরাল গ্রামের এক ৯৫ বৎসর বয়স্কা অন্ধ বৃদ্ধার মুখে শুনেছি।

বৃদ্ধা বলেছেন : বাবা, এসব কথা আমার শ্বশুর-শাশুড়ির মুখে শোনা। একালের মানুষ কি এসব বিশ্বাস করে! আসল কথা কি জানো—বিশ্বাস করলে সবই আছে।

জবাব দিলাম : ঠিক বলেছেন বুড়িমা। বিশ্বাস করলে সবই আছে, বিশ্বাস না করলে কিছুই নেই।

মাদরালের আশেপাশে মাঠভরা ফসল। কোন মাঠ খালি নেই—মৃত্তিকা জননী যেন সন্তান কোলে করে বসে আছেন।

দোসঁতীনের পুকুর আবার কি!

দুই সতীন তাদের কোন ছেলেমেয়ে ছিল না তাই তাদের নাম যাতে অমর অক্ষয় হয়ে থাকে সেই আশায় এই পুকুর কাটিয়েছিলেন।

সবই আছে এ পৃথিবীতে।

নেই শুধু আমাদের আত্মবিশ্বাস!

সমস্ত জাতিই বুঝি এ জিনিষটা হারিয়ে ফেলেছে, তাই এত হতাশা, এত অশান্তি, এত হাহাকার।

দোসতীনের পুকুর-ধারে দাঁড়িয়ে কি হয়তো ভাবছিলাম।

এমন সময়ে শুনলাম কে যেন গান গাইছে—

"যে বলে আছো তুমি
তার কাছে আছো সদাই
যে বলে নাই তুমি
তার কাছে ঠিকই নাই।
এ নহে প্রবোধবাক্য ঐক্যতানে শুনতে পাই।
এ যে সত্য মধুর ধ্বনি
বেদপুরাণ আর চণ্ডীর বাণী
ধর্মগ্রন্থ আছে, মুনি ঋষিগণ আর পণ্ডিত গোঁসাই।
আছো নাই তোমারই সৃষ্টি
তোমার সকলি মিষ্টি
রেখো কেবল এই দৃষ্টি যেন ভ্রষ্ট পথে নাহি যাই।
ভবা পাগলার অন্তকালে
আছো নাই সবাই মিলে
দুজনাই দিও বলে প্রভুর যেন দেখা পাই।"

লোকটার কাছে গিয়ে বললাম: এ গান তুমি কোথায় শিখলে? ওবা পাগলাকে-চেনো নাকি?

না বাবু হয়তো মা চণ্ডীরই কেউ হবে।

ঠিকই বলেছ ভাই, মায়ের সঙ্গে নিকট সম্বন্ধ না থাকলে গান কি কেউ বাঁধতে পারে!

বিকাল হয় হয়। ফিরতে হবে।

এই মেলাতে আগে সার্কাস পার্টিও নাকি আসতো। এখনও আসে তবে ছোট ছোট পার্টি। তিনদিন ধরে বেশ জমজমাট মেলা বসে। সারি সারি চালা বেঁধে দোকান বসে। মিষ্টি, চিড়ে-মুড়ি, খেলনার দোকানই বেশী আসে।

জয়চণ্ডীকে প্রণাম করে মাদরাল গ্রামের ভিতর ঢুকলাম। বেশ বড় গ্রাম এবং গ্রামও খুব প্রাচীন। কিছুদূরে গিয়ে দেখি বিরাট প্যাগোডা, বুদ্ধ ও মহাদেবের মূর্তি। আরও দেখলাম বিরাট একটা পাথরের ষাঁড়। এখানে একটা ঝোলানো সেতুও আছে।

এসব তৈরী করেছিলেন এই গ্রামের এক কৃতী সন্তান। কলকাতা পুলিশের ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের একজন। নাম পঞ্চানন ঘোষাল। অপরাধতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর কয়েকখানা মূল্যবান বই আছে। এখানে একটা বি. টি. ট্রেনিং কলেজ আছে। আজও অনেক মানুষ কেউ নৈহাটি নেমে, কেউ বা কাঁকিনাড়ায় নেমে এখানে আসেন এইসব দেখতে। অদৃষ্ট হস্তের দৌলতে আজ এখানকার অনেক কিছুই নেই। মানুষ সব পারে।

তা না হলে এমন একটা সুন্দর জায়গার, সুন্দর শিল্পকর্ম কিভাবে নষ্ট হয়ে গেল।

সাধনের দোলেতে এসে দেখে যান ভাঙাগড়ার ইতিহাস।

———

শ্যামনগর পৌষ কালীর মেলা

"নমস্তেহস্তু মহা রৌদ্রে মহা ঘোর পরাক্রমে
মহাবলে মহোৎসাহে মহাভয় বিনাশিনি
ত্রাহিমাং দেবী দুষ্প্রেক্ষ্যে শত্রুনাং ভয়বর্দ্ধিনি"

হে দেবি!

তুমি মহারুদ্রের শক্তি স্বরূপিণী। তুমি মহাপরাক্রমশালিনী। তুমি মহাবলধারিণী তুমি আমাকে রক্ষা করো।

রক্ষা করো মা তোমার অধম সন্তানে—জীবপালিনী, জগন্মাতা তুমি যুগে যুগে পালন করছ, রক্ষা করছ, দমন করছ, তুমিই তো সব। তুমি ছাড়া আর সত্য কি আছে?

ব্রহ্মময়ী মা তুমিই তো ভরসা—তোমার ভরসাতেই এই সংসারে খেলাঘর পেতেছি—খেলা শেষে তোমার কোলে যেন আশ্রয় পাই।

ব্রহ্মময়ীর দর্শন পেতে গেলে যেতে হবে শ্যামনগর। কলকাতা থেকে ১৯ মাইল দূরে গঙ্গার ধারে মা আমার ব্রহ্মময়ীরূপে সন্তানকে আশীর্বাদ করবার জন্য বসে আছেন। স্টেশন শ্যামনগর, কিন্তু জায়গার নাম মুলাযোড়। এই মুলাযোড়েই প্রসিদ্ধ কালীবাড়ী ও দ্বাদশ শিবমন্দির। সারা বছরই মানুষের আসা-যাওয়ায় বিরাম নেই! গঙ্গার এপার ওপার সব পার থেকেই মানুষের আসা ও যাওয়া চলছে। পৌষ মাসে মানুষ যেন ভেঙে পড়ে এখানে। মেলাও বসে অনেকটা জায়গা ঘিরে। ভীড় ঠেলে মন্দিরে পৌঁছাতেও অনেক সময় লাগে। পূজার লাইনও বেশ লম্বা হয়। পৌষ মাসে কালী দর্শনে মহাপুণ্য, এই আশাতেই মানুষ পৌষ মাসে মাতৃদর্শন করে।

মায়ের আমার কত রূপ, কত নাম। কোথাও মা আমার আতা মা, কোথাও সিদ্ধেশ্বরী, কোথাও বিশালাক্ষী, কোথাও তারা মা, কোথায়ও মা ললাটেশ্বরী, কোথাও মা জয়চণ্ডী, কোথাও আবার ব্রহ্মময়ী।

কত নাম।

যে যেভাবে যে নামে ডাকবে, সেই নামেই মা কৃপা করবেন।

মুলাজোড়ের ব্রহ্মময়ী কে?

চলুন একটু পিছিয়ে যাই কলকাতার পাথুরিয়াঘাটায়।

পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুর এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে যে, গোপীমোহনের সাত বছরের কন্যা ব্রহ্মময়ী মারা গেলে তার দেহ ভাসতে ভাসতে শ্যামনগর মূলাযোড়ের ঘাটে এসে লাগে। সেই রাতেই গোপীমোহন স্বপ্নে আদেশ পান মূলাযোড়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে পুজো করতে।

এই মূর্ত্তিই ব্রহ্মময়ীরূপে মূলাযোড়ে পূজিতা হচ্ছেন।

এই মন্দিরের দেবী আজ সারাদেশে শ্যামনগরের কালী নামে খ্যাত।

ট্রেন পথে আসা-যাওয়ার সময় দেখা যায় শ্যামনগরে ট্রেন এসে থামলে প্রতিটি যাত্রীই হাতজোড় করে মায়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাচ্ছেন। মা আমার মন্দিরে বসে অগণিত সন্তানের প্রণাম গ্রহণ করছেন।

নাই বা হল ফুল, বেলপাতা, ফল সন্দেশ।

একনিষ্ঠ ভক্তিই তো সব।

শ্রদ্ধা আর ভক্তি।

ভক্তি আর শ্রদ্ধা।

একাগ্রতা আর একনিষ্ঠতা।

এই তো পূজার উপকরণ।

এখানে আনন্দশংকর, গোপীশংকর ও হরশংকর নামে তিনটি বৃহৎ শিবলিঙ্গ আছে। ব্রহ্মময়ীর মন্দিরের পিছন দিকে আলাদা একটা মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ আছে। কালী বাড়ীতে প্রতি মাসের অমাবস্যায় রটন্তী কালী পূজা। চতুর্দ্দশী ও কালী পূজার সময় খুব সমারোহ হয়। সারা পৌষ মাস মানুষ পৌষকালীর মেলা দেখতে আসে।

তুলসীর মালা, চন্দন, নামাবলী, কাঠের জিনিষ, পাথরের জিনিষের দোকানই বেশী আসে। ছাপা কাপড়ের দোকানও বসে অনেক। মন্দিরের নীচে দিয়েই গঙ্গা বয়ে চলেছে—

একই যাত্রায় গঙ্গাস্নান ও মাতৃদর্শন দুই-ই।

"অন্নদামঙ্গল" প্রণেতা মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে ব্রহ্মোত্তর পেয়ে বাসভবন তৈরী করে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এখানেই কাটিয়েছিলেন। এখান থেকে কিছু দূরে কাউগাছি গ্রামে একটা প্রাচীন গড় আছে। বর্গীর হাঙ্গামার সময় বর্দ্ধমানের তৎকালীন নাবালক মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের জননী এখানে গড় বেষ্টিত এক প্রাসাদ নির্মাণ করে আত্মরক্ষা করেছিলেন। এই গ্রামের পাশেই রহুতা গ্রামে বাংলার প্রখ্যাত সাহিত্যিক রঙ্গলাল

মুখোপাধ্যায় ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই রঙ্গলালই প্রসিদ্ধ বিশ্বকোষ অভিধানের প্রধান সম্পাদক ছিলেন।

শ্যামনগরের স্টেশন প্ল্যাটফরম পার হয়ে কিছুদূরেই মায়ের মন্দির। যদি আরও দূর পথ হত তাতেই বা কি এসে যেতো। মাকে দেখতে আরও দূর, অনেক দূর পথ যাওয়া যায়। মা যে কৃপাময়ী। তিনি তো কৃপা করবার জন্যই সর্বত্র বসে আছেন।

সাধক কমলাকান্তের বিশালাক্ষী আছেন—খানা জংশন স্টেশন থেকে তিন মাইল দূরে, বামাক্ষেপার মা তারা আছেন, রামপুরহাট থেকে পাঁচ মাইল দূরে তারাপীঠে। মানকর স্টেশন থেকে আড়াই মাইল দূরে অমরার গড়ে আছেন সাধক কেনারামের মা সিদ্ধেশ্বরী। চণ্ডীদাসের বাশুলী দেবী আছেন কতদূরে নান্নুরে।

মানুষ সর্বত্রই দর্শন করতে যাচ্ছে।

হোক না দূর—

মায়ের কাছে সন্তান যাবেই তা সে যত দূরই হোক।

আপনিও যত দূরেই থাকুন, মায়ের জন্য যদি মন কেঁদে ওঠে, তাহলে চলে আসুন শ্যামনগরে।

শূন্য হাতেই আসুন ক্ষতি নেই।

কিন্তু হৃদয় যেন পরিপূর্ণ থাকে ভক্তি আর শ্রদ্ধায়।

ঠাকুরনগরে হরিঠাকুরের মেলা

"আমিই হরি, সবাই হরিনাম কর। এই নামই মন্ত্র, এই নামেই দীক্ষা, এই নামেই শিক্ষা, এ ছাড়া আর কিছুই নেই।"

এ কথা বলেছিলেন প্রায় ৩০০ বছর আগে বাংলার এক মহামানব, ঈশ্বরতত্ত্ববেত্তা, পরমজ্ঞানময় হরিঠাকুর।

বর্তমানে ঠাকুরনগরে এঁর লীলাক্ষেত্র। বহুকাল আগে কোন এক চৈত্র শেষে মধুকৃষ্ণ ত্রয়োদশীতে এই মাটির পৃথিবীতে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাই প্রতি বছর চৈত্র মাসের শেষ থেকে বৈশাখের প্রথম সপ্তাহপর্যন্ত ঠাকুরনগরে বিরাট জায়গা জুড়ে এক মেলা বসে। সুদূর আন্দামান, দণ্ডকারণ্য থেকে সুরু করে এপার বাংলা ওপার বাংলার অনেক জেলা থেকে হাজার হাজার মানুষ এসে জড়ো হয় ঠাকুরনগরে। চৈত্র মাসের শেষ থেকেই শিয়ালদহ ডিভিশনের বড় বড় ষ্টেশনে, যেমন—বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, বনগাঁয় এই সময় দেখা যায় দলে দলে ভক্তরা চলেছেন ঢাক, ঢোল বাজিয়ে কীর্তন করতে করতে, হাতে তাদের ছোট ছোট লাল নিশান। হাজার হাজার নারী পুরুষ, তার মধ্যে বৃদ্ধ-যুবক, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে যেন স্রোতের টানে ভেসে চলেছে ঠাকুরনগরের পথে।

কি অপরূপ দৃশ্য।

কে এমনভাবে টানতে পারে এত মানুষকে ?

মহাশক্তির অধিকারী তিনি না হলে এমন কাজ কখনই সম্ভব নয়।

ইষ্টার্ণ রেলের শিয়ালদহ বনগ্রাম শাখার ছোট একটা ষ্টেশন ঠাকুরনগর। রাণাঘাট বনগাঁ লাইনে গিয়ে বনগাঁ থেকে কলকাতার দিকে ট্রেনে উঠলে দু'তিন ষ্টেশন পর ঠাকুরনগর। নৈহাটি থেকে হাবড়ার বাসে উঠে সেখান থেকেও ঠাকুর নগরে যাওয়া যায়।

ঠাকুরনগর ষ্টেশন থেকে আট মাইল গেলেই মেলা-স্থানে পৌছানো যায়। এখানে হরিমন্দির আছে, আর আছে তাঁর ভক্তদের মূর্তি। সব সময় মানুষ আসছে, পুজো দিচ্ছে, অনবরত নাম কীর্তন চলছে। এখানে মানুষ, ওখানে মানুষ, মাঠে মানুষ, মেলায় মানুষ। সর্বত্রই মানুষের মেলা। মেলাও বেশ বড়।

সার্কাস থেকে সুরু করে পুতুল নাচ সবই আছে। আসপাশ ভরে যায় নানান রকম দোকানে।

এখানে এলে মনে হয়—এই যে হাজার হাজার মানুষ দেশ বিদেশ থেকে আসে, এদের থাকা খাওয়ার কি ব্যবস্থা হয়। এ সম্বন্ধে সন্ধান নিয়ে জানলাম যে, যত লোকই আসুক প্রত্যেককেই চাল ডাল প্রভৃতি দেওয়া হয়, থাকার জায়গাও যত্রতত্র। কারও কোন অভিযোগ নেই, কারও কোন অসন্তোষ নেই। সবাই যেন এক সুরে বাঁধা।

আজকের ঠাকুরনগরের এই যে, গরিমা, এই যে মাহাত্ম্য এর প্রধান পুরোহিত বাংলার জননেতা, মননেতা, এককালের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার ও মন্ত্রী শ্রীপ্রভাতরঞ্জন ঠাকুর সংক্ষেপে পি. আর, ঠাকুর। কুশলী রূপকারের মত তিনি ঠাকুরনগরের রূপ দিয়েছেন।

ঠাকুর বংশের চতুর্থ পুরুষ তিনি। এঁর আগের তিনজন শশীভূষণ, গুরুচাঁদ ও হরিঠাকুর।

এই মেলা, মন্দির ঘুরে একটা কথা নিশ্চয়ই মনে হবে, সে কথাটা—কে এই হরিঠাকুর ?

এবার বলি সেই কথা—

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব মালদহে খেতুর নামক জায়গায় তাঁর খেতুরলীলা সাঙ্গ করে সবাইকে বললেন—"এরপর আমি এই দেশের ঈশান কোণে কোন এক জায়গায় অবতীর্ণ হবো। তোমরা সবাই হরিনাম কর।" এখনও এই নাম, তখনও এই নাম।

এই কথা বলে তিনি খেতুর লীলা সাঙ্গ করলেন। মহাপ্রভুর নীলাচলে লীলা সম্বরণ করার বহুকাল বাদে বর্তমানে বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায় ওড়াকান্দী গঞ্জের শাবলডাঙ্গা গ্রামে এক মহাপ্রাণ হরিভক্ত যশোবন্ত ঠাকুরের ঘর আলো করে জন্ম নিলেন হরিঠাকুর। কে ইনি ? এমন নয়ন ভোলানো রূপ, কপালে যেন তিলক লেপন। দুই ভ্রূযুগলে যেন কালো মেঘের পরশ, নেত্রদ্বয়ে চমক লাগানো দ্যুতি।

সবাই চমকে যায়।

যশোবন্ত ঠাকুর হরিনামেই পাগল।

হরিঠাকুর হাসেন।

দেখতে দেখতে কিশোরের সিঁড়িতে এসে পা দেন হরিঠাকুর। বিশ্বনাথ, ব্রজনাথ, নাটু প্রভৃতি সঙ্গীদের নিয়ে রাখালের মত গরু চরান।

এসব দেখলে মনে পড়ে যায় ব্রজের রাখাল বালকদের কথা। কি আশ্চর্য্য! গরুগুলো যেন তাঁর কথায় যাচ্ছে।

তিনি থামলে গরুগুলোও থেমে যায়।

চললে তারাও চলে।

এ কেমন মানুষ অবলা গরুও যার কথা বোঝে।

হরিঠাকুর যৌবনের প্রথম ধাপে এসে দাঁড়ালেন!

এই সময় কিছু অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয়।

বিসূচিকা রোগে মৃত এক মহিলা ও মৃত গো-বৎসকে তিনি বাঁচিয়ে দেন।

বিশ্বনাথ, ব্রজনাথ ও নাটু ঠাকুরের সঙ্গ কোন-সময়ে ছাড়ে না।

গোষ্ঠে এসেছেন শ্রীকৃষ্ণ আব ঐ তিনজন যেন বলাই, শ্রীদাম আর সুদাম।

এসব কথা জানা যায় হরি লীলামৃত গ্রন্থে আর জানতে পেরেছি হরিঠাকুরের ভক্তদের মুখ থেকে।

মন্দিরের সামনে বেশ ভীড়, একজন ভক্ত তার নাম সন্তোষ পাল এসেছেন আড়ংঘাটার কাছে আনন্দনগর গ্রাম থেকে।

তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম—এখানে কি এমন জিনিষ প্রত্যক্ষ করেছেন যার জন্ত মানুষ এত ভক্তি করে ঠাকুরকে।

সন্তোষ পাল বললেন—কে কি পেয়েছেন তা আমি জানি না, তবে আমি ঠাকুরের অপার কৃপা লাভ করেছি—তা না হলে আজ আমি এখানে দাঁড়িয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারতাম না।

কি রকম?

হ্যাঁ বাবু! আমি হাঁপানী রোগে মৃতপ্রায় হয়েছিলাম। হেঁটে এঘর থেকে ওঘর যেতে পারতাম না। একবার প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়ে পড়লাম যন্ত্রণা নিয়েই—মরে তো যাবই, ঠাকুরের মন্দিরে আমি যাবই। ঠাকুরের নাম নিয়ে এই মন্দিরে এসে পৌছে ঠাকুরের সামনে কান্নাকাটি করলাম। সেই রাত্রেই আমি রোগমুক্ত হলাম। এই তো আজ ক'বছরের কথা।

একটু থেমে বললেন—ঠাকুর তো মানুষ নয় বাবু! তিনি যে ভগবান।

হরিঠাকুর মানুষের বেশে, মানুষের মত আচরণ করলেও তিনি মানুষ ছিলেন না।

একটা শক্তি তাঁর নিশ্চয়ই ছিল।

তা হচ্ছে ঐশ্বরিক শক্তি।

যুগে যুগে কত মহামানব এসেছেন মানুষের মাঝে—খুঁজতে হবে, খুঁজে নিতে হবে।

না খুঁজলে কি তাঁকে পাওয়া যায়?

নামগানে সমস্ত অঞ্চলটাই যেন মুখরিত।

মাঝে মাঝে মেয়েদের সম্মিলিত উলুধ্বনি।

ওদিকে মেলায় বেচাকেনা চলছে। চিড়ে, মুড়কী আর মিষ্টির দোকানই বেশী।

ট্রেনের সময় হয়ে আসছে।

এবার ফেরার পালা।

হরিমন্দিরে প্রণাম করে যখন ষ্টেশনের পথে উঠলাম তখন বেলা প্রায় যায় যায়।

আর একটু বাদেই সন্ধ্যা নামবে।

জীবনের স্বর্ণ-সন্ধ্যা।

জলেশ্বরের চৈত্রসংক্রান্তির মেলা

হুগলী জেলার তারকেশ্বরে যেমন চৈত্রসংক্রান্তিতে গাজনের সন্ন্যাসীর ভীড় জমে, তেমনি ভীড় হয়তো আর কোথায়ও হয় না। বাংলার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তের মানুষ আসে "বাবা তারকনাথ" ধ্বনি দিতে দিতে। কাঁধে তাদের বাঁক, তাতে গঙ্গাজলের ছোট ছোট কলসী, ঘট। বাবার উদ্দেশ্যে পুজো দিয়ে তারা ধন্য হয়। পুণ্যের ঘর পূর্ণ করে ভক্তি-অর্ঘ্য দিয়ে।

আমি বলছি জলেশ্বরের কথা। সেখানেও চৈত্র সংক্রান্তিতে গ্রাম গ্রামান্তর থেকে সন্ন্যাসীর দল আসে, আসে আশপাশের মানুষ। সেখানে বসে বিরাট এক মেলা। জলেশ্বরের কোন প্রচার নেই, তাই ক'জনই বা জানে এর নাম! কোথায় জলেশ্বর, আর কেমন করেই বা যেতে হয়, তাই বা কজন জানে! দেব-দেবতা সারা দেশ জুড়ে। কোথায় নেই তিনি! শুধু ভক্তিভাবে ডেকে একবার বসাতে পারলেই হোল। যেখানে ভক্তি, সেখানেই তো তিনি। যেমন তারকেশ্বরে তারকনাথ, বৈদ্যনাথধামে বৈদ্যনাথ, নেপালে পশুপতিনাথ, কাশ্মীরে অমরনাথ, তেমনি জলেশ্বরেও ভোলানাথ।

জলেশ্বর!

কি মিষ্টি নাম!

একপারে ঘোজা আর একপারে জলেশ্বর।

মাঝে যমুনা।

তাল নারকেলের বনে ভরা গ্রাম। মেঠো রাস্তা। চারদিকে নাম-না-জানা বনের ঝোপ।

বন-জংগলে ঘেরা গ্রাম জলেশ্বর।

হোলই বা বন-জংগল। তবুও একবার ইচ্ছে হোলেই ঘুরে আসতে পারেন। শিয়ালদহ বনগাঁ সেকশনে ঠাকুরনগর অথবা চাঁদপাড়া ষ্টেশনে নেমে যাওয়া যায় জলেশ্বর।

ঠাকুরনগর থেকে মাইল দুই আড়াই হবে, আর চাঁদপাড়া থেকে মাইল চারেক।

কাঁচা মাটির পথ।

লোকজন সবাই এই পথেই চলে।

প্রতি চৈত্র সংক্রান্তির দিন এই কাঁচামাটির পথ ধূলি মুখর হোয়ে ওঠে মানুষের পথ চলায়। কত গ্রাম থেকে আসে সন্ন্যাসীর দল; আশেপাশের গ্রাম শহর থেকে যাত্রী আসে অনেক। দোকানদাররা গরু মোষের গাড়ীতে নানান্ রকম জিনিষ নিয়ে এসে দোকান সাজায়।

সারা গ্রামে যেন একটা আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। শিবের গাজনের সুরে চারিদিকে যেন মেতে ওঠে।

কত রকমারী দোকান। মাটির হাঁড়ি, খেলনা, পাটি, মাদুর, বাঁসের তৈরী ঝুড়ি, কুলো, কাঠের জিনিষ, খাবারের দোকান—সবই এসে হাজির হয় এইদিন। সন্ধ্যেবেলা জঙ্গলে ভরা গ্রাম আলোয় আলো হয়ে যায়। মানুষের সোরগোল, সন্ন্যাসীদের ধ্বনিতে, দোকানদারের চীৎকারে মেলা জমে ওঠে।

জলেশ্বরের মেলা বহু প্রাচীন।

কত প্রাচীন, তা কেউ সঠিক বলতে পারে না। আর কি করেই বা জানা যাবে। বাংলা ও বাঙ্গালীর ইতিহাসে বা চব্বিশ পরগণা জেলার ইতিহাসে জলেশ্বরের নাম কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

প্রতি বছর চৈত্র সংক্রান্তিতে মানুষ আসে, পুজো দেয়, এইটেই বড় সত্য—এই তো ইতিহাস।

মানুষ পুরানো হয়, মানুষ হারিয়ে যায়, আবার নতুন মানুষ আসে, তারা এসে পুরানো মানুষের কথা বলে। সেইসব কথাই হচ্ছে এইসব মেলার পুরানো ইতিহাস,—যা বইতে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় মানুষের মুখে।

প্রাচীন মানুষের মুখে শোনা যায় যে, এই জলেশ্বরে এককালে চৈত্রসংক্রান্তির দিন চড়ক ভেসে উঠতো। ঢাক ঢোলের বাজনা শোনা যেতো, শাঁখ আর কাঁসরের বাজনা শোনা যেত। শত শত মানুষ নাকি নিজের চোখে সেই সব দেখছে।

এখন কাল বদলেছে, মানুষ বদলেছে বিশ্বাসও আজ নেই, তাই এসব দেখা যায় না।

যে বিশ্বাসে এসব সম্ভব হোত, সে বিশ্বাস মানুষের আজ কোথায়? তাই সেই বিশ্বাস হারিয়ে আমরা সবকিছুই হারিয়েছি।

আজও মেলা বসছে, মানুষও আসছে দেশদেশান্তরের; শুধু সেই চড়ক আর ভেসে ওঠে না, ঢাক ঢোলও আর বাজে না।

তবুও মানুষ বিশ্বাস করে একদিন সবই ছিল, আজ কিছুই নেই।

মেলা দেখা যার নেশা, বিশ্বাস আজও তার একেবারে হারিয়ে যায় নি। সে হয়তো সুযোগ পেলে নিশ্চই যাবে জলেশ্বরের মেলায়।

কে জানে, হয়তো কোন ভিখারীর বেশে অথবা সন্ন্যাসীর দলে সন্ন্যাসীর দেহে তিনি ভক্তের আশেপাশে মনের বাসনা পূর্ণ করে থাকেন।

মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনই তো মেলা।

জলেশ্বরও তাই জাগ্রত।

বিনি সূতায় যিনি বছর বছর হাজার হাজার মানুষকে টেনে আনছেন, তিনি জাগ্রত বই কি!

জলেশ্বরের পাশেই ঠাকুরনগর। বাংলার জননেতা পি. আর. ঠাকুরের স্বপ্ন ও সাধনা এখানে বাস্তব রূপ ধারণ করেছে। এখানে "হরি ঠাকুরের" মেলা একটা বিখ্যাত মেলা।

ঘুঁটিয়ারী শরীফের মেলা

হিন্দু আর মুসলমান।

মুসলমান আর হিন্দু।

এই দুইয়ের সম্মেলন একটা দর্শনীয় জিনিষ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। একই দরজায় হিন্দু মুসলমান পূজো দিচ্ছে, শিরনি প্রসাদ খাচ্ছে। ধর্মসম্মেলনে পাশাপাশি বসে পীর-পয়গম্বরের উপদেশ শুনছে। আমি হিন্দু তুমি মুসলমান—তুমি হিন্দু আমি মুসলমান এসব ধুয়ে-মুছে যায় যেখানে সেখানে তীর্থস্থান হবে—এ আর নতুন কি।

বিরাট দেশ ভারতবর্ষ।

যুগে যুগে, কালে কালে, পৃথিবীর বহুদেশের মানুষের, বহু জাতির পদধূলি পড়েছে এই দেশের মাটিতে—মানুষকে কি কোরে আপন কোরতে হয় তা শিখেছে পৃথিবীর মানুষ এই দেশের কাছ থেকে।

সে দেশের হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বসে ধর্ম উপদেশ শুনবে এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

এই সম্মেলন দেখতে হলে আপনাকে যেতে হবে ঘুঁটিয়ারী শরীফ। কোলকাতা থেকে ক্যানিং লাইনে বিশ মাইল গেলে এই তীর্থে পৌছানো যাবে। শিয়ালদহ ক্যানিং শাখায় দশটা ষ্টেশন পার হোলেই ঘুঁটিয়ারী শরীফ রেল ষ্টেশন। ষ্টেশনের কাছেই বিখ্যাত পীর মোবারক গাজীর দরগা বা মসজিদ। মুসলমানদের একটা পবিত্র তীর্থস্থান এই ঘুঁটিয়ারী শরীফ। কিন্তু এই মহাতীর্থ শুধু মুসলমানদের নয়। এ তীর্থ হিন্দুরও। কারণ দেশ-বিদেশের মুসলমানরাও যেমন আসে, হিন্দুরাও তেমনি আসে।

হিন্দুই বা কে আর মুসলমানই বা কে। একই পিতার সন্তান। সে পিতা খোদা বা ভগবান।

এক কবি বলেছেন—

"কালো গরু ধলা গরু
একই রঙের দুধরে ভাই
একই রঙের দুধ।

জগত ভরমিয়া দেখলাম
একই মায়ের পুত্তরে ভাই
একই মায়ের পুত ॥"

প্রতি বছর ১০ই শ্রাবণ এখানে বিরাট এক ধর্ম সম্মেলন হয়। সে উপলক্ষ্যে সারা মাস ধরে মেলা বসে মানুষের। মেলা বসে নানান জিনিষের। মেলা বসে মণ্ডা মিঠাইয়ের।

অম্বুবাচীর সময় হয় পীরের ফতেয়া উৎসব। পীরের উদ্দেশ্যে সবাই এখানে শিরনি, গোলাপজল ও প্রদীপ উৎসর্গ করে। এই সময়ে বারুইপুরের রায়-চৌধুরীদের দেওয়া শিরনি প্রথম নেওয়া হয়। শ্রাবণের মেলাতেও সবাই মসজিদে নানারকম জিনিষ উৎসর্গ কোরে পীরের আশীর্বাদ কামনা করে। এখানকার শিরনির যে কি আস্বাদ তা না খেলে বোঝা যাবে না।

মোবারক গাজী সম্বন্ধে বিশেষ কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে নানান রকম জনশ্রুতি ও প্রবাদ আছে যার ওপর ভিত্তি কোরে আজও হাজার হাজার মানুষ মোবারক গাজীর মসজিদে আসে এবং শ্রদ্ধাভরে প্রণতি জানায়। আজকের ঘুঁটিয়ারী শরীফ তৎকালে মদনমল পরগণার অন্তর্গত ছিল। এটাকে সুন্দর-বনের অংশও বলা হোত।

মোবারক গাজী অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। বনের হিংস্র ব্যাঘ্র ও অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারদের তিনি বশীভূত কোরতে পারতেন। বাঘের পিঠে চড়ে তিনি সর্বত্র চলাফেরা কোরতেন। ভীত মানুষকে অভয় দিয়ে তিনি ঐসব জায়গায় মানুষের বসতি স্থাপন কোরেছিলেন। হিন্দু মুসলমান সকলেরই তিনি পরম শ্রদ্ধার পাত্র।

একবার নাবালক জমিদার সময়মত খাজনা দিতে না পারায় খুব বিপদাপন্ন হোয়ে তিনি গাজী সাহেবের শরণাপন্ন হন। তিনি বাঘের পিঠে চড়েই রাজধানীতে যান। বাদশা তাঁর ক্ষমতা দেখে বিস্ময়ে অবাক হোয়ে যান ও অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে তাঁকে মদনমল পরগণা দান করেন। উক্ত জমিদার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বাঁশড়ার জঙ্গল পরিষ্কার কোরে একটা মসজিদ তৈরী কোরে দেন —একটা পুকুর ও খনন করে দেন। শুধু তাই নয় মসজিদের ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি কয়েক শত বিঘা জমিও দান করেন। সেই জমির আয় থেকেই আজও পর্যন্ত উৎসব ও মেলার জন্য খরচ হোচ্ছে।

এই ভাবে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে এই পবিত্র তীর্থ ঘুঁটিয়ারী শরীফ। বাঁশড়ার

গাজীর গানের প্রসিদ্ধি এ অঞ্চলে সর্বজন বিদিত। মোবারক গাজী যে একজন সিদ্ধ পীর তার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়

একবার অনাবৃষ্টিতে দেশে অজন্মা হয়। ঘরে ঘরে হাহাকার—জমি ফেটে চৌচির। পাড়ায় পাড়ায় প্রতি ঘরে ক্ষুধার্তের ক্রন্দন। এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই —আকাশের দিকে চেয়ে সকলের চোখ যেন আঁধার হোয়ে আসে।

গ্রামের সবাই মসজিদে এসে মোবারক গাজীর কাছে ধর্ণা দিল। মোবারক গাজী একবার আকাশের দিকে তাকালেন। গলায় লাল পলার মালাটা ঘোরাতে লাগলেন।

দেশের মানুষ না খেয়ে মারা যাবে? খোদার রাজ্যে এ কি করে সম্ভব! তিনি খোদার দরবারে আর্জি পেশ করবার জন্য মসজিদের ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। নির্দেশ দিলেন কেউ যেন ঘরের ভিতর না ঢোকে। যতই দেরী হোক দরজা বন্ধই থাকবে। তিনি "খোদা মেহেরবান" বোলতে ঘরে ঢুকে দরজা দিলেন।

বাইরে গ্রামের মানুষ পালা কোরে বসে রইল। একদিন, দুদিন, তিনদিন কেটে গেলো, কোন সাড়াশব্দ নেই। সবাই শঙ্কিত হোলেন তবে কি গাজী সাহেব দেহত্যাগ কোরলেন। দরজা ভেঙ্গে সবাই ঘরে ঢুকে দেখে গাজীসাহেব শুয়ে আছেন! চোখ বন্ধ, দেহ অসাড়, বুকেরও কোন স্পন্দন নেই। তবে তিনি বুঝি সত্যিসত্যিই দেহত্যাগ কোরলেন।

বালক বৃদ্ধ সবার চোখের জলে মসজিদ প্রাঙ্গণ সিক্ত হয়।

গ্রামের মানুষ ভেঙে পড়ে মসজিদের চারপাশে।

জীবিত নেই ভেবে মোবারক গাজীকে ঐ মসজিদের ঘরের মেঝেতেই কবর দেওয়া হয়।

সেই রাতেই মোবারক গাজী তাঁর এক প্রিয় শিষ্যকে স্বপ্ন দেন যে তাঁকে ভুল কোরে জীবিত অবস্থাতেই কবর দেওয়া হোয়েছে। সবাইকে বোল কোন ভয় নেই। মিলেমিশে সবাই যেন বাস করে।

ভারতবর্ষে যুগে যুগে মহাপুরুষরা এসেছেন। তাঁরাও ঐ একই কথা বোলে গেছেন—মিলেমিশে থাকো। সে মহাবাণী কি আজকের মানুষ গ্রহণ করতে পেরেছে? পারেনি—তাই দিকে দিকে এত অসন্তোষ, এত হানাহানি।

কয়েক বছর আগে ঘুঁটিয়ারী শরীফ যাবার পথে আগের ষ্টেশন পিয়ালীতে এক বৃদ্ধ মুসলমানের সাথে আলাপ হোয়েছিল। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বোলেছিলেন —বাবারে গাজীসাহেব কে, আর কোথায় পাবো? এ জনমের মত তিনি কবরে

ঘুমিয়ে আছেন। কে জানে আবার হয়তো কোন মানুষের দেশে গিয়ে জন্ম নিয়েছেন।

অবাক হোয়ে বোলেছিলাম—মানুষের দেশে! তবে এটা কি মানুষের দেশ নয়।

বৃদ্ধ হেসে বোললেন—মানুষের দেশ কি আর আছে বাবা! গাজী সাহেব গোস্তাকী মাফ করো, তোমার পায়ের কাছে একটু জায়গা দাও।

ঘুঁটিয়ারী শরীফে নেমে তিনি ভীড়ের মধ্যে কোথায় যে মিশে গেলেন তা আর বোঝা গেলো না।

পাথরের মূর্তি ভেঙে যায়। মন্দির-মসজিদও ভেঙে পড়তে পারে। কিন্তু মানুষের মন থেকে এইসব লোকদেবতাকে মুছে ফেলা যাবে না।

পবিত্র তীর্থ ঘুঁটিয়ারী শরীফে যেতে যদি সাধ হয়, তবে সাধ্যেও নিশ্চয়ই কুলাবে। বাংলার লোকসংস্কৃতির বিরাট অঙ্গনে ঘুঁটিয়ারী শরীফ আজও মাথা উঁচু কোরে দাঁড়িয়ে আছে—একবার মাথা নীচু কোরে ঘুরে আসতে দোষ কি!

আপনার নীচুমাথা কিছুতেই খোয়া যাবে না, একথা আমি জোর কোরেই বোলতে পারি।

গঙ্গাসাগর একবার

'সব তীর্থ বার বার।

গঙ্গাসাগর একবার ॥'

আজ থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে গঙ্গাসাগর খুব দুষ্কর তীর্থ ছিল। তখনকার দিনে পথ-ঘাট যানবাহনের এত উন্নতি হয়নি। নানান রকম বিপদে পথ-ঘাট ছিল ভরা। কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না—এই বিশ্বাসে ধর্মপ্রাণ নরনারী হাজারে হাজারে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যেতো। তার মধ্যে কিছু মানুষ হয়তো আর ফিরে আসতো না। কেউ কেউ চোর-ডাকাতের হাতে সর্বস্বান্ত হোত। কেউবা যেতো বাঘ কুমিরের পেটে। কেউবা প্রাণ হারাতো নৌকা-ডুবিতে। কেউবা যেতো রোগে। তাই আগেকার দিনে গঙ্গাসাগর যাওয়ার নাম কোরলে কান্নাকাটি পড়ে যেতো।

আজ সব পরিবর্তন হোয়ে গেছে। রাজ্য সরকার, ২৪ পরগণা জেলা বোর্ড রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ সবার সহযোগিতায় গঙ্গাসাগর আজ আর দুষ্কর তীর্থ নেই। আজ গ্রাম-গঞ্জ, শহর সব জায়গা থেকে মানুষ নিরাপদে গঙ্গা-সাগর গিয়ে পুণ্য অর্জন কোরে আসছে। সারা ভারতে গঙ্গাসাগরের মত এত লোক সমাগম আর বোধ হয় কোথাও হয় না। ভারতের এমন জায়গা নেই, যেখান থেকে মানুষ আসে না। রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা থেকে সরাসরি বাসে হাজার হাজার যাত্রী আসেন গঙ্গাসাগরে। এখনও প্রতি বছর সংবাদপত্রে জানা যায় যে দুর্ঘটনায়, মহামারীতে বেশ কিছু যাত্রী মারা গেছে কিন্তু তা জানা সত্বেও মানুষের আসার বিরাম নেই। জন্মালে মরতে হবে—এই তত্ত্ব জেনেই বোধ হয় এত মানুষের সমাগম হয়। পুণ্য অর্জনের নেশা মানুষের এক চিরন্তন নেশা। এ নেশায় মানুষকে মাতাল করে। ধর্মের নেশা মদের নেশা থেকেও ভয়ানক। অবশ্য সবটাই ভক্তিরসে সিঞ্চিত।

'জয় কপিলমুনি' বোলে চলুন এবার যাত্রা করি গঙ্গাসাগরে।

ট্রেনে বা বাসে যে যেখান থেকে আসুন সবাইকেই ডায়মণ্ড হারবার যেতে হবে। পৌষ সংক্রান্তির ৬/৭ দিন আগে থেকেই এখানে মানুষ জমতে থাকে। সংক্রান্তির তিন চারদিন আগে ডায়মণ্ড হারবারের চারপাশে মানুষের ভীড়ে পথ চলা যায় না। অসংখ্য বাস, ট্যাক্সি সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সব বাসেই

সমান ভীড়। দম আটকানো চাপাচাপি তবুও যেন কারও ভ্রূক্ষেপ নেই।

দাঁড়িয়ে থাকলে তো চলবে না। ছোট কম্বল জড়ানো শয্যা আর ঝোলানো থলেটা কোনমতে সামলে নিয়ে উঠে পড়ুন যে কোন একটা বাসে। ভাগ্যক্রমে বসার জায়গা যদি মিলে যায় তাহলে তো আপনি ভাগ্যবান।

এখান থেকে বাস যাবে নামখানা। ভাড়া লাগবে ২'৮৭ পয়সা। সুন্দর পীচের রাস্তা। দু'পাশে ধানের ক্ষেত। মাঝে মাঝে আম কাঁঠালের বন। পথের ধারে বাড়ীঘর পার হোয়ে বাস ছুটে চলেছে নামখানার দিকে।

মাঝে মাঝে যাত্রীরা হাত দেখায়।

কিন্তু হাত দেখালে কি হবে।

'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট এ তরী।'

আড়াই ঘণ্টা গাদাগাদি হোয়ে থাকার পর বাস এসে নামখানায় থামে। এবার লঞ্চে উঠতে হবে। নামখানার ঘাটে সারি সারি লঞ্চ দাঁড়িয়ে আছে। চটপট উঠে পড়তে হবে—দেরী কোরলে আর জায়গা পাওয়া যাবে না। এই লঞ্চ সোজা চলে যাবে সাগর মেলায়। ভাড়া জন প্রতি ছয় টাকা। লঞ্চে উঠেই ঘন ঘন শোনা যায়—"জয় কপিল মুনির জয়"। খুচরা পয়সা জলে ছুঁড়ে ফেলার হিড়িক পড়ে যায়। লঞ্চে প্রায় চার ঘণ্টা কাটানোর পর এসে পড়লেন সাগরে। একেবারে মেলার জায়গায়।

মনে হবে এক নতুন জগতে এসে পৌছালেন। প্রায় পাঁচলক্ষ বর্গগজ জুড়ে গঙ্গাসাগর মেলা। এই ক'দিন আগে সারা অঞ্চল জুড়ে এক গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ কোরত আর আজ কোলাহলে ভরা সাগর তীর। বিস্তীর্ণ বালুকা-ভূমির উপর সারি সারি খড়ের আর হোগলার অস্থায়ী ঘর। ভিতরে বিচুলি পাতা। ভাড়া দৈনিক তিন টাকা। যে কোন একটা ঘর নিয়ে বিচুলির ওপর সতরঞ্চি পেতে একটু জিরিয়ে নিন।

দুরন্ত ঠাণ্ডা এসে আপনার সারা দেহে বরফ ছিটিয়ে দিয়ে যাবে। সমুদ্রের ধারে কনকনে বাতাস আপনার শিরায় শিরায় কাঁপুনি ল্যগাবে।

গঙ্গাসাগরে তিন দিন স্নান। সংক্রান্তির আগের দিন বাউনি। পরদিন মকর সংক্রান্তির স্নান, তৃতীয় দিন পয়লা মাঘ উত্তরায়ণের স্নান। এ দিন একটা স্মরণীয় দিন। এইদিন গঙ্গাপুত্র ভীষ্মের মৃত্যুদিন। তারপরই ঘরে ফেরার পালা।

সারা মেলা জুড়ে আলোয় আলোময়। এ মেলায় কি না আসে। চাল, ডাল, নুন, তেল, তরি-তরকারী, চিড়ে মুড়ি। বড় বড় খাবারের দোকান, হোটেল, কাপড়ের দোকান, কাঠের জিনিষপত্তর, পাথরের থালাবাটি। লোহা-লক্কড়, গরম কাপড়, সব কিছুরই দোকানী এসে পশরা সাজিয়ে বসে।

১৮৯৯ সালে এ মেলায় তদারকীর ভার নেন ২৪ পরগণা জেলা বোর্ড। তাঁরাই মন্দির তৈরী করেন। দু দু'বার মন্দির সরিয়ে নিয়ে যেতে হয় সে ব্যায়-ভারও তাঁরা গ্রহণ করেন। বর্তমানে রাজ্য সরকার গঙ্গাসাগর মেলার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে নিয়ে লাখো লাখো যাত্রীর সুখ স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা কোরেছেন। সরকারী ভাণ্ডার থেকে প্রতি বছরই ৪/৫ লাখ টাকা ব্যয় হয়। এই সময় এখানে একটা বিরাট সরকারী হাসপাতাল বসে। একটা অস্থায়ী কোর্টও রাজ্যসরকারকে বসাতে হয়। কয়েক হাজার পুলিশ ও সরকারী কর্মচারী দিনরাত কর্মরত থাকে মেলা স্থানে।

তীর্থস্থানে কোর্ট বসে শুনলে দুঃখ হয়। তীর্থস্থানে চোর-ডাকাত ছিনতাই-কারীও আসে। আসে পকেটমার, আসে নানান রকম ঠগ। তাদের মধ্যে অনেকেই সংক্রান্তিতে স্নান করে সাগরে। কপিল মুনির মন্দিরে পূজোও দেয়।

একই মন।

পাপ ও পুণ্য দুজনেই ঘর বেঁধেছেন।

কি বিচিত্র মানুষ।

সবচেয়ে যাঁদের আগমনে সাগর মেলা অপরূপ রূপ ধারণ করে তাঁরা হোচ্ছেন হাজার হাজার সাধু সন্ত। যাঁরা লোকালয়ে থাকেন না। পাহাড় পর্ব্বতে ঘন বন-বনানীর অন্তরালে যাঁরা সাধন ভজনে রত তাঁরা এই সময়ে এসে মেলার মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করেন। কত রকমের যে সাধু আসেন তার ইয়ত্তা নেই।

কেউ বালির মধ্যে মুণ্ডু গুঁজে রেখে ঠ্যাং উঁচু কোরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিচ্ছেন। কেউ বা চারিদিকে ধুনী জালিয়ে যোগাসনে বসে আছেন। কেউবা সাগর জলে গলা ডুবিয়ে হাত জোড় কোরে ওপরের দিকে তুলে রেখেছেন।

ভারত সেবাশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশন, আরও অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠান এখানে কয়েকদিন ধরেই যাত্রীদের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করেন। বর্তমান বছরেই মহাপুরুষ সীতারাম দাস ওঁকারনাথজী 'ওঁঙ্কারনাথ আশ্রম' স্থায়ীভাবে কোরেছেন গঙ্গাসাগরে। রাজ্য সরকার কর্তৃক একটা বিরাট জলাধার থেকে জল পরিস্রুত কোরে সারা মেলায় খাবার জল হিসাবে সরবরাহ করা হয়।

কপিল মুনির মন্দিরে পূজো দেওয়ায় ভীড় জমে মাইল দুই থেকে। সবাই লাইনে দাঁড়ান। টাকা পয়সা আর ফলমূলে ভরে যায় মন্দির। সব প্রণামীই চলে যায় অযোধ্যার মোহান্তের কাছে। এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। রাজ্য সরকার লাখ লাখ টাকা খরচ কোরে মেলা পরিচালনা করেন আর প্রণামীর সবটাই চলে যায় অযোধ্যায়।

স্নান সারা হোলে কাঁপতে কাঁপতে আপনার সেই হোগলার ছাউনি দেওয়া ঘরে এসে গরম কাপড়ে দেহটাকে জড়িয়ে বসুন।

সাগরে এলেন, স্নান কোরলেন, পূজা দিয়ে পুণ্য অর্জন কোরলেন—সবই তো হোল। কিন্তু কেন এই মেলা। কে এই কপিল মুনি, এসব না জানলে তো আসল জিনিষই অজ্ঞাত থেকে যাবে।

সংক্ষেপে বর্ণনা করি শুনুন—

সগর বংশ উদ্ধারের জন্য সূর্যবংশের এক মহান তপস্বী ভগীরথ কঠোর তপস্যা কোরে জননী জাহ্নবীকে মর্ত্যে এনেছিলেন।

ভগীরথ অবিরাম শঙ্খ বাজিয়ে চলেছেন তাঁর পিছে পিছে চলেছেন গঙ্গা। ভগীরথকে অনুসরণ কোরে আসতে আসতে সাগরমেলায় কপিল মুনির আশ্রম স্পর্শ করা মাত্র সগর রাজার ষাট হাজার পুত্রের পুনর্জন্ম লাভ হয়। গঙ্গাস্পর্শে যেখানে ষাট হাজার পুত্র পাপমুক্ত হোয়ে নতুন জন্মলাভ করে সেখানে পবিত্র স্থান হবে তাতে আর সন্দেহ কোথায়।

আজকের মানুষ জ্ঞানে-অজ্ঞানে দৈনন্দিন জীবনের দাবদাহে পাপ কিছু কিছু কোরে থাকেনই এ কথা অস্বীকার করা যায় না, এ পাপ থেকে মুক্ত হোতে কে না চায় তাই শত কষ্ট উপেক্ষা কোরেও মানুষ জলের স্রোতের মতই সাগর মেলায় এসে আছড়ে পড়ছে।

সগরের পিতা রাজা রাহু তাঁর রাজ্য হারিয়ে হিমালয় পর্বতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর কিছুকাল কেটে যায়। এমন সময় এক মুনির আশ্রমে রাহুর স্ত্রীর এক পুত্র সন্তান হয়। ইনিই পরবর্তীকালে রাজা সগর নামে খ্যাত হন।

উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান ছিলেন সগর রাজা। তিনি পিতার হৃত-রাজ্য উদ্ধার কোরে একশত অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। কিন্তু যজ্ঞা-নুষ্ঠানের কিছু আগে এক বিপত্তি ঘটে যায়। দেবরাজ ইন্দ্র এই যজ্ঞ পণ্ড করার জন্য যজ্ঞের শেষ অশ্বটি চুরি কোরে একেবারে পাতালে কপিল মুনির আশ্রমে

রেখে আসেন। সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র চারিদিক খোঁজাখুঁজির পর যজ্ঞের অশ্ব না পেয়ে মাটি খুঁড়ে পাতালে গিয়ে কপিল মুনির আশ্রমে অশ্ব বাঁধা আছে দেখে কপিল মুনিকেই চোর সাব্যস্ত করেন এবং তাঁর ওপর নির্য্যাতন করেন।

কপিল মুনি ক্রোধে জ্বলে ওঠেন—তাঁরই অভিশাপে ষাট হাজার পুত্র পুড়ে ছাই হোয়ে যায়।

এই ষাট হাজার পুত্রের ত্রাণকর্ত্তা হোলেন ভগীরথ।

ওকি চমকে উঠছেন কেন? বাইরে চলেছে ঘরে ফেরার পালা তাই এত হৈ-চৈ। এবার তৈরী হোয়ে নিন। ঘরে তো ফিরতে হবে। ঘরের মানুষ যে বাইরের মানুষের জন্য উদাস নয়নে চেয়ে আছে।

মায়াধীশ ঈশ্বরের একি খেলা। ঘর থেকে বার কোরে নিয়ে আবার ঘরে ফেরৎ পাঠায়।

তাঁর ঘরে জায়গা মেলে ক'জনার?

চুঁচুড়ার ষণ্ডেশ্বরতলার মেলা

"জলে হরি, স্থলে হরি,
সূর্যে হরি, চন্দ্রে হরি,
অনিলে অনিলে হরি,
হরিময় এ ভূমণ্ডল।"

কোথায় নেই সেই পরম করুণাময় ভগবানের পদরেণু। সারা ভারতবর্ষই যেন দেবতার লীলাভূমি। উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমে, উর্দ্ধে অর্দ্ধে সবত্রই তাঁর স্থিতি। রামেশ্বর থেকে পশুপতিনাথ, বারাণসী থেকে তারকেশ্বর, তারকেশ্বর থেকে ষণ্ডেশ্বরতলা একই, তিনি বহু হোয়ে বিরাজমান।

এক এক জায়গায় তিনি এক এক রকম লীলা কোরেছেন। মানুষ প্রাণভরে তাই দেখেছে, বুঝেছে একজন আছেন যিনি সর্বময় কর্তা। জেনেছে আর যা আছে সব মিথ্যা।

এই তো ভারতবর্ষের ইতিহাস। এ তো যুদ্ধজয়ের ইতিহাস নয়। এ ইতিহাস রাজা-মহারাজা নবাবদের উত্থান-পতনের ইতিহাস নয়। এ ইতিহাস আধ্যাত্মিকতার ইতিহাস।

ষণ্ডেশ্বরতলার ইতিহাস সেই ইতিহাসেরই একটা খোলা পাতা। সামনের বৈশাখের ১লা থেকেই সেখানে ঢাক-ঢোলের বাদ্যির মাঝে ষণ্ডেশ্বর শিবের মহাপূজার ধূমধাম আর বিরাট মেলা। ষণ্ডেশ্বরতলার বেতবনে মাটির মন্দিরে সাড়ে চারশো-পাঁচশো বছর আগে যে পূজার ধূমধাম হোত, আজও ঠিক তেমনি ভাবেই পূজা হোচ্ছে। ষণ্ডেশ্বরতলার মৃত্তিকায় বহু সাধক মহাপুরুষের পদধূলি পড়েছে। কথিত আছে পরম সাধক স্বামী বিশুদ্ধানন্দ এইখানেই একদিন দেবাদিদেব মহাদেবের দর্শন পেয়েছিলেন।

১৮৭৬ সালে ৺গৌরীকান্ত রায় বর্তমানের মন্দিরটি স্থাপন কোরেছিলেন। কিন্তু চিরকাল তো কিছু থাকে না। দেখতে দেখতে সংস্কারের অভাবে তা জীর্ণ-দশা ধারণ করে। ১৯৬০ সালে এখানে শ্মশানের ওপর সিদ্ধেশ্বরী মাতার মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। তারপর থেকেই ষণ্ডেশ্বর শিবের মন্দির সংস্কারের চিন্তা এ অঞ্চলের ভক্তবৃন্দের অন্তরে জাগরূক হয়। বর্তমানে ষণ্ডেশ্বর মন্দির যাতে নোতুন ভাবে রূপ নেয় সেই চেষ্টা চলছে। মহৎ প্রচেষ্টা কোনদিন ব্যর্থ হয় না, তাই আশা

করা যায় এ মন্দির একদিন সারা দেশের মানুষের কাছে দর্শনীয় হবে।

হাওড়া থেকে ট্রেনে এসে চুঁচুড়া নেমে বাসে ষণ্ডেশ্বর তলা যেতে হবে। নামতে হবে কামারপাড়ায়। ভাড়া কুড়ি পয়সা। শিয়ালদহ থেকে আসতে হোলে কাঁকিনাড়ায় নেমে ভাটপাড়ার ঘাট পার হোয়ে ওপারেই ষণ্ডেশ্বরতলা।

সাড়ে চারশো বছর আগে এখানে গভীর বেতবন ছিল। হিংস্র জীবজন্তু ঘুরে বেড়াতো। ভাগিরথীর তীরে এই নির্জন শ্মশান ভূমিতে দিনের বেলায় কেউ আসতে সাহস পেতো না। তৎকালে এখানে হালদার বংশীয় মানুষেরই প্রাধান্য ছিল বেশী। এই হালদার বংশের একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ ৺দিগম্বর হালদার স্বপ্নে আদেশ পেয়ে গঙ্গাগর্ভ থেকে শিবমূর্তি তুলে নিয়ে এখানে প্রতিষ্ঠা করেন। সেই থেকেই এই মূর্তি ষণ্ডেশ্বর শিব নামে পূজিত।

চৈত্রের শেষের দিকে গাজন পূজা প্রচলিত হোয়ে আসছে সেই সময় থেকে আজও পর্যন্ত বংশানুক্রমে এই হালদার বংশে। মেলাও বসছে সেই সময় থেকে, তবে সেকালের মেলা আজকের মেলার মত নয়। বেতবন পরিষ্কার কোরে যে মেলা তখন বসতো সে মেলা ছাঁচ-বাতাসার মেলা। সে মেলা শাঁখা-সিন্দুরের মেলা আর গ্রামের শিল্পীদের পোড়া পুতুলের মেলা। গাজনের গান হোত তখন সারা দিন-রাত পালা কোরে এক এক দফে। আজকের মেলার মাঝে সে মেলা হারিয়ে গেছে। আজকের মেলা অহঙ্কারের মেলা। আজকের মেলা পয়সার মেলা, আজকের মেলায় রঙ-বেরঙী দোকানের ছড়াছড়ি। আজ শাঁখার বদলে স্থান নিয়েছে প্লাষ্টিক আর নাইলনের চুড়ি ছাঁচ-বাতাসা আজ রসগোল্লা, সন্দেশ, আর মিহিদানায় রূপান্তরিত হোয়েছে।

অনেকখানি জায়গা নিয়েই মেলা বসে। বেতের তৈরী জিনিষ, কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল, ধামা-কুলোর দোকানও বসে। বেতবন আর সে জীবজন্তু আজ নেই।

আজ সারা অঞ্চল আলো কোরে রেখেছেন জাগ্রত ষণ্ডেশ্বর শিব। এখানকার চড়কও দেখবার জিনিষ। একখানা ধারালো ফলার ওপর সন্ন্যাসীরা অনেক উঁচু থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে কিন্তু ষণ্ডেশ্বরের কৃপায় তাদের গায় কোন আঁচড়ই লাগে না।

১লা বৈশাখ ভৈরব পূজার সমারোহ। পূজো শেষে দুটো ছাগবলি হয়। পরে সেই ছাগরক্তে সন্ন্যাসীদের স্নান করানো হয়।

ষণ্ডেশ্বরতলার ইতিহাসে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেছে যা আজকের অবিশ্বাসী মানুষ কিছুতেই তা বিশ্বাস কোরবে না। কিন্তু যা ঘটেছে তা সত্য এবং আজও তা বহুল প্রচারিত। ১৮০৩ সালে হালদার বংশের ঘনশ্যাম হালদার যখন একনিষ্ঠভাবে গাজন পূজায় রত ছিলেন তখন ঢাক বাজছিল অবিরাম। তৎকালীন চুঁচুড়ার ডাচ কমিশনার জে. এম. ব্রীচ সদলবলে এসে সেই ঢাক বাজাতে নিষেধ করেন ও নানান রকম ভয় দেখান। ঘনশ্যাম আদেশ মানেন না। কেন তিনি মানবেন? তিনি যাঁকে স্মরণ নিয়ে আছেন সেখানে তো কোন ভয় নেই। কমিশনার তাঁর দেওয়া বান ফলা করে তার ওপর সন্ন্যাসীদের ঝাঁপ দিতে বোললেন। যদি সন্ন্যাসী অক্ষত থাকে তাহলে ঢাক বাজাতে তিনি অনুমতি দেবেন আর তা যদি না হয় তাহলে এই মন্দির ও ষণ্ডেশ্বর শিব তিনি তুলে গঙ্গায় নিক্ষেপ কোরবেন।

ঘনশ্যাম হালদার একমনে ষণ্ডেশ্বর শিবকে ডাকছেন। ষণ্ডেশ্বর তাঁকে স্বপ্নাদেশ দিলেন যে শ্বেতমক্ষিকা রূপে যখন তিনি বানফলা করে তার ওপর বসবেন তখন যেন সন্ন্যাসীরা ঝাঁপ দেয়।

সত্যসত্যই বান ফলা করে তার ওপর যখন শ্বেতমক্ষিকা এসে বসে তখন সন্ন্যাসীরা ঝাঁপ দিলেন ঐ বানফলাকার ওপর। টুকরো হোয়ে গেলো বানফলাকা।

কমিশনার ব্রীচ সাহেব ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি মন্দিরে একটা পিতলের ঢাক উপহার দিলেন। আরও নির্দেশ দিলেন যে ঢাক বাজানো এখানে কোন-দিন বন্ধ হবে না।

এখনও ষণ্ডেশ্বরতলায় সেই পিতলের ঢাক বাজানো হয়। এ ধরনের অনেক ঘটনা যা বিস্তারিত বোললে চমৎকৃত হোতে হয়।

ষণ্ডেশ্বরতলার মেলা আজও বসছে। কত মানুষ আসছে। মেলা শেষে যে যার ঘরে চলে যাচ্ছে। কিন্তু যা চিরকালের, যা নিত্যবস্তু সেই ষণ্ডেশ্বর মন্দির সংস্কারের কাজে আজ যাঁরা ব্রতী হোয়েছেন তাঁরা দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে ধন্যবাদযোগ্য। এমনি ধারা মন্দির আজ দেশের অনেক জায়গায় রয়েছে—হয়তো কেউ সংস্কার না কোরলে একদিন তা চিরকালের মত মৃত্তিকা গর্ভে বিলীন হোয়ে যাবে। কিন্তু তা হোলে তো সবই গেলো।

আজকের মানুষকে এভাবে দিন কাটালে তো চলবে না। দেবত্ব লাভই তো মানুষের সাধনা। দেবতার সান্নিধ্যে যাওয়াই তো মানুষের তপস্যা। সবার

ওপর মানুষ যদি সত্য হয় তাহলে মানুষের সমাজকে দেবতার উপনিবেশ তৈরী কোরতে হবে।

বেতবনের ষণ্ডেশ্বর শিব তোমার অপার করুণা সকলের মস্তকে বর্ষিত হোক। এমন বেতন তুমি তাদের দাও যাতে মনপ্রাণ ভরে যায়।

মেলা দেখতে এসে শুধু মেলা দেখলেই চলবে না। দেখতে হবে দেখার জিনিষ। জানতে হবে সেই অজ্ঞাতকে, সন্ধান কোরতে হবে সেই হারিয়ে যাওয়া পরমপুরুষকে।

মনপ্রান এক কোরে বোলতে হবে—তুমি এসো, আমরা দেখি—তোমাকে যে আমরা কোনদিনই দেখিনি।

শ্রীরামপুরের শিবচতুর্দ্দশীর মেলা

জগদুদ্ভব-পালন-নাশকরং কৃপয়ৈব পুনস্ত্রয়রূপধরম্।
প্রিয়মানবাসাধু জনৈকপতিং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥
ন দেয়ং পুষ্পং সদাপাপচিত্তে পুনর্জন্ম দুঃখাৎ পরিত্রাহি শম্ভো।
ভজতোঽখিল দুঃখ সমূহ হরং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥

বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে এমন শ্লোক শোনা যাবে আগামী শিবচতুর্দ্দশীর দিন শ্রীরামপুরের ক্ষেত্রমোহন সাহা ষ্ট্রীটে। সামনের ১৫ই ফাল্গুন ইংরাজী ২৮শে ফেব্রুয়ারী ওখানে গেলেই দেবমন্দির দর্শন। নর-নারায়ণের অবিরাম স্রোত আর দেখতে পাবেন শিবচতুর্দ্দশীর বিরাট মেলা।

এবার অসুবিধা নেই। দিনটা পড়েছে শনিবার। সারা দিনরাত ঘুরে ঘুরে দেখতে পারেন। দেখার জিনিসও তো কম নেই।

আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনে সুখ-শান্তি কোথায়। অভাব আছে, অনটন আছে, আছে শোকতাপ। এসব থাকবে, কোনকালেই যাবার নয়। পূর্ব-পুরুষরা এক টাকা মণ চাল খেয়েও বলে গেছেন এত কষ্টে আর সংসার চালানো যায় না। মেয়ের বিয়ে দিতে হবে ষোল টাকা ভরি সোনা, কি করে যে কি হ'বে।

আজ আমরা তাঁদেরই বংশধর হয়ে চার টাকা কেজি চাল খেয়ে আর দু'হাজার টাকা সোনার ভরি দেখেও বলছি কি করে চলবে। বাঁচার রাস্তা নেই। আমাদের পরেও যারা আসবে তারাও ঐ একই কথা বলবে।

এক বাহু আগে কহ আর। সুতরাং ওসব ভেবে লাভ নেই। বাঁধন কেটে মাঝে মাঝে বের হতে হ'বে। কোথায়? যেখানে আনন্দ আছে, আছে একটু শান্তি। খাবো খাবো বলেই জনম গেল। পাবো পাবো বলে কই মন তো পাগল হ'ল না। জপে বসে ছেলে-মেয়ের কথা ভাবলাম, তপে বসে বিষয় সম্পত্তির কথা চিন্তা করলাম।

কিন্তু সে আসল ধনে ধনী হতে আর পারলাম কই।

* * *

শ্রীরামপুর নেমে পূবদিকে আর. এম. এস মাঠের পাশ দিয়ে বি. পি. দে রোড চলে গেছে ক্ষেত্রমোহন সাহা ষ্ট্রীটে। এইখানেই ক্ষেত্রমোহন সাহার

বাড়ীতেই শিবচতুর্দ্দশীর মেলা বসে। যেখানে মেলা বসে সে বারুণাটাও বিরাট। শুধু এক বিঘে জমির উপরই বসে মাটির পুতুলের প্রদর্শনী। সারা মেলার দর্শনীয় জিনিস হল পুতুল প্রদর্শনী। মাটির পুতুলের মাধ্যমেই রামায়ণ, মহাভারতের কথা। মাটির পুতুলের মাধ্যমেই আমাদের সমাজ জীবনের ছবি, আমাদের উত্থান পতনের কথা ফোটানো হয়। মাটির পুতুলই সীতা হয়ে পাতালে প্রবেশ করছে। রাবণ হয়ে রামের সাথে যুদ্ধ করছে। দুর্যোধন হয়ে পাশা খেলছে আবার দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণও করছে, মাটির পুতুল হয়ে আমার ঘরের ছেলে মস্তান সেজে ছিনতাই করছে, ছেলে নিজেই বিয়ে করে বাপ মাকে কাঁদিয়ে চলে যাচ্ছে।

এমনি ধারা আরও অনেক কিছু।

এখানে হর-পার্বতী ও রাধাকৃষ্ণের মন্দির আছে।

খেলার অনেক পুতুল রয়েছে এই মন্দিরের ভিতরে।

এ তো পুতুল নয়।

প্রাণপুতুল।

আমাদের জীবন-জাহ্নবী যেন ঐ পুতুলের নির্দ্দেশেই চলছে বয়ে। আমরা তো ভবার্ণবে নৌকা ভাসিয়ে বসে আছি ওঁরা মাঝি হোয়ে বেয়ে নিয়ে চলেছেন।

মেলায় কত রকম দোকানী। প্রায় সবকিছুই আসে। এ মেলা কতদিন থেকে বসছে সঠিক জানা না গেলেও এটুকু জানা যায় যে প্রায় ১০০ বছরের ওপর হবে এ মেলা বসছে। ক্ষেত্রমোহন সাহা নামটা বাঙালীর মত মনে হোলেও আসলে উনি বিহারী ছিলেন—এখন তাঁর বংশধরদের দেখলে বাঙালীই মনে হবে।

পশ্চিমবাংলার ইতিহাসে শ্রীরামপুর একটা বিখ্যাত নাম। এখানেই ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে ১১৩ বছর বয়সে প্রখ্যাত জগন্নাথ পণ্ডিত দেহত্যাগ করেন। মিশনারীরা বাংলা গদ্য ভাষায় এখানেই প্রথম পুস্তক রচনায় হাত দেন। বিখ্যাত পণ্ডিত উইলিয়ম কেরী ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ভাষায় প্রথম মাসিক পত্রিকা 'দিগদর্শন' প্রকাশ করেন। এখানকার মাটিতে বসেই মার্শম্যানের সম্পাদনায় প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়। উইলিয়ম কেরী এদেশে এসেছিলেন ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে—কিন্তু তিনি এদেশে এসে তাঁতী, জোলা, কামার, কুমার প্রভৃতি সকলের সঙ্গে মিশে তাদের কাছ থেকে বাংলা ভাষা আয়ত্ত করেন।

এখানকার পঞ্চানন কর্মকার প্রথম কাঠ খোদাই কোরে বাংলা হরফ তৈরী করেন এবং সেই হরফে হালহেড সাহেব ব্যাকরণ ছাপেন।

মেলা দেখতে এসে শুধু মেলা দেখলেই কাজ মিটে যায় না—জায়গাটির সম্বন্ধেও সংক্ষেপে একটু বলা দরকার। তাই মেলা থেকে একটু সরে গিয়েছিলাম।

মেলার একপাশে সার্কাসের তাঁবু পড়েছে। একজন ক্লাউন সেজে মুখের মধ্যে আগুন পুরে খেলা দেখাচ্ছে বাইরের সেটে।

আরও এগিয়ে চলুন। ওতে আর নতুনত্ব কি আছে। আমরাও তো এখানে এক একজন ক্লাউন সেজে সংসারের সার্কাসে খেলা দেখাচ্ছি। আর যিনি ক্লাউন সাজালেন তিনি বসে হাসছেন ঐ মন্দিরের মধ্যে।

এ খেলার যেন শেষ নেই।

কিন্তু হে দেবাদিদেব, হে গোপেশ্বর মহাদেব। তোমার নামে মেলা বসে। তোমার ধামে মানুষ আসে।

কিছু দাও তাদের!

ধারাপাতের পাতায় শূন্য হোয়ে আর কত কাল তারা পড়ে থাকবে। তাদের পাশে তুমি কিছু একটা অক্ষর হোয়ে বসে তাদের পূর্ণ করো।

চন্দননগরে যাদুঘোষের রথের মেলা

নিমগাছে চাঁপা ফুল!

এ কথা কে বিশ্বাস কোরবে? আজকের মানুষের কাছে এটা সম্পূর্ণ আজগুবী ঘটনা বোলেই মনে হ'বে। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করুক আর নাই করুক তাতে কিছু আসে যায় না। এ ঘটনা ঘটেছিল চারশো-সাড়ে চারশো বছর আগে চন্দননগরে। সে সময় জীবিত মানুষদের মধ্যে অনেকেই এ ঘটনা প্রত্যক্ষ কোরেছিল।

সত্য যা চিরকালই সত্য তার কোন মিথ্যা রূপ নেই। যিনি পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করান তাঁর কাছে সবই সম্ভব। বিশ্বাস নাইবা কোরলেন তবুও শুনুন—

শুনতে তো আর দোষ নেই। দেবদেবতার কথা মিথ্যা বোললেও নাকি লাভ আছে। যে বলে এবং যারা শোনে দু'তরফেই লাভ হয়।

আজ থেকে প্রায় ৪৫০ বছর আগে সস্ত্রীক যাদুগোপাল ঘোষ চলেছিলেন পুরীর পথে জগন্নাথ দর্শনে, সে সময় রেলপথ ছিল না। সবাইকে হেঁটেই তীর্থ-ধর্ম কোরতে হোত। গ্রামের মানুষ দল বেঁধে যেতেন তীর্থ থেকে তীর্থে। ভগবান চৈতন্যদেব হেঁটে গিয়েছিলেন নীলাচলে। সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও শান্তিপুর থেকে হেঁটে পুরী গিয়েছিলেন।

সস্ত্রীক যাদুগোপাল ঘোষ চলেছেন পুরীর পথে। পথের পর পথ, বন-জঙ্গল পার হোয়ে দিনের পর দিন চলেছেন। জগন্নাথ দর্শন যে কোরতেই হবে। শরীর ফেটে রক্ত ঝরছে—কাঁটাও বিঁধছে। কখনও নদী নালাও পার হোতে হচ্ছে।

কি নিদারুণ কষ্ট!

পদে পদে বিপদ—তবুও চলেছেন তাঁরা। লক্ষ্য এক। পুরীর প্রায় কাছাকাছি এসে এক চটিতে তাঁরা আশ্রয় নিলেন। সমস্ত শরীর অবসন্ন। আর যেন তাঁদের চলবার ক্ষমতা নেই। দু'জনই অসুস্থ হোয়ে পড়লেন। সঙ্গীরা কেউ থাকতে চায় না। একদিন সবাই ওদের ফেলে চলে গেলেন।

দুজনেই শয্যায় শুয়ে চোখের জল ফেলছেন।

আর মনে মনে ভাবছেন—প্রভু? এতদূর এলেও তোমার দর্শন আমাদের ভাগ্যে হবে না। তুমি কি আমাদের কৃপা কোরবে না। আমাদের ফিরেই কি যেতে হবে!

দু'জনই এইসব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লেন।

যাদুঘোষ স্বপ্নাদেশ পেলেন—তোমরা ফিরে যাও। সেখানে তোমরা আমার নিত্যদর্শন পাবে।

চমকে উঠলেন তিনি।

স্ত্রী শুনে বললেন : তাহলে কি হবে—চলো ফিরে যাই।

যাদুঘোষ বোললেন : তা তো যাবো কিন্তু নিত্যদর্শন কিভাবে হবে।

রাত পোহালো।

দুজনে উঠলেন। শরীরে ক্লান্তি যেন আর নেই।

সামনের পথ দিয়ে একপাল গরু চলেছে। পিছনে রাখাল, গরু রেখে তাদের সামনে এসে রাখাল ছেলেটা হঠাৎ বোললে : কি গো তোমরা এখনো রওনা হওনি।

আবার চমক লাগে যাদুঘোষের। এ রাখাল ছেলেটা কি করে জানলে।

ছেলেটা আবার বোললে : কিগো, দেরী কোরছ কেন ? যাত্রা শুরু করো। রথের আর কতই বা দেরী।

: কিন্তু বাবা জগন্নাথদেব তো স্বপ্নে বোললেন বাড়ী ফিরে গেলে তাঁকে আমরা নিত্যদর্শন কোরতে পারবো। আমার বাড়ীতে কোন মন্দির নেই, মূর্তিও নেই, কি ভাবে দর্শন হবে।

: ওগো সব হবে। গিয়েই দেখতে পাবে সব কিছুরই ব্যবস্থা আছে, মূর্তিও ঠিক সময়ে প্রতিষ্ঠিত হবে।

স্ত্রী এবার মুখ খুললেন : বাবা তুমি কে !

রাখাল হাসছে—আমি রাখাল। তোমরা ফিরে যাও, টাকা পয়সার জন্য কোন ভাবনা নেই। যা খরচ হবে সবই আছে তোমার ঘরে।

যাদু ঘোষ সোজা হোয়ে দাঁড়ালেন—বাবা তোমার বাড়ী কোথায় ?

: সবার বাড়ী আমার বাড়ী—তোমরা এগোও, আমি চললাম। এক লহমায় গরুর পাল আর রাখাল কোথায় গেলো কে জানে।

রাখাল যেখানে দাঁড়িয়েছিল সে মাটিতে স্বামী-স্ত্রী গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। চোখের জলে তাদের বুক ভেসে যায়।

আবার দীর্ঘদিন পথ হেঁটে ওরা দু'জন এসে পৌছালেন চন্দননগরে। বাড়ীতে এসে দেখেন বাঁশ ও খড়ের গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে উঠানে।

ওদের দেখতে পেয়েই তারা বোলে উঠলেন : বাবু আমাদের টাকা দিয়ে দেন। এসব নামিয়ে কাজে লেগে যাই। ঘর বাঁধতেও তো সময় লাগবে।

যাদুঘোষ অবাক হোয়ে বোললেন: আমি আবার তোমাদের এসব আনতে বোললাম কবে।

বাঁশওয়ালা বোললে: সেকি বাবু, আপনি বোললেন চলো, বাড়ী যাই তোমাদের হিসাব সব মিটিয়ে দেবো। ঘরে তোমাদের টাকা তোলা আছে।

যাদুঘোষ ঘরে গিয়ে বাক্স খুললেন—

ঠিক যে টাকাটা ওরা চেয়েছে সেই টাকাটাই রয়েছে।

তিনি এনে ওদের হাতে তুলে দিলেন সেই টাকা।

স্বামী স্ত্রী ঘর বন্ধ কোরে গেলেন গঙ্গাস্নানে।

ঘাটের ওপরে এক নিমগাছ ছিল।

হঠাৎ তাঁরা স্নান কোরে দেখলেন সারা নিমগাছে চাঁপা ফুলে ভরে আছে।

এর আগেও তাঁরা এ নিমগাছ দেখেছেন—

আজও আবার দেখলেন।

কিন্তু একি দেখলেন তাঁরা?

সেই রাতেই আবার ওরা স্বপ্নাদেশ পেলেন: ঐ নিমগাছের কাঠ দিয়ে আমার, সুভদ্রা ও বলরামের মূর্তি তৈরী কোরে রথের দিনে প্রতিষ্ঠা করো।

যাদুগোপাল ঘোষ জগন্নাথদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা কোরলেন। কাঠের রথও তৈরী হোয়ে গেলো।

সেই থেকেই প্রতিবছর রথের সময় যাদুগোপাল ঘোষের রথ আর মেলা হোয়ে আসছে।

আজ পাঁচ বছর হোল ব্রেথওয়েট কোম্পানী ষ্টীল ও অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে বিরাট রথ তৈরী কোরে দিয়েছেন। বর্ত্তমানে একতলা দালান বাড়ীতেই মন্দির হোয়েছে।

চন্দননগর লক্ষ্মীগঞ্জ থেকে একেবারে তালডাঙা পর্যন্ত এক মাইল জুড়ে বিরাট মেলা বসে। এ রথের বৈশিষ্ট্য হোচ্ছে সোজা রথ থেকে উল্টোরথ পর্যন্ত নয়দিন জগন্নাথদেব নয় রকম বেশ ধারণ করেন। এই ক'দিন নিত্য খিচুড়ি ভোগ হয় ও সন্ধ্যায় নামকীর্ত্তনে মুখরিত থাকে।

মেলায় নানান রকম জিনিস আসে। সবচেয়ে বেশী আমদানী হয় নানা-রকম গাছ-গাছালীর চারা। নারকোলের চারাই বেশী আসে। আশপাশ ও দেশ-বিদেশ থেকে অনেক মানুষ আসে এইসব চারা কিনতে।

পুতুল নাচ বসে। ছোটখাটো দু'একটা সার্কাসও আসে।

রথ দেখা আর কলা-বেচা দুইই যদি সারতে চান, তাহলে সামনের রথে চলে আসুন চন্দননগরে। কোলকাতা থেকে বাইশ মাইল পথ আসতে আর কতইবা সময় লাগবে। চন্দননগর ষ্টেশনে এসে রিক্সায় বা হেঁটে মাইল-দেড়েক গেলেই রথের মেলায় পেঁাছে যাবেন।

আগের বছর রথের মেলাতেই আলাপ হোয়েছিল চুঁচুড়ার গোলকানন্দ হাজরার সঙ্গে। জগন্নাথদেবের প্রতি তাঁর অগাধ ভক্তি। অনেকবার তিনি পুরী গেছেন। তিনিই আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবকিছু দেখিয়েছিলেন। পুরীর মাহাত্ম্য নিয়ে তিনি এক কাব্য সঙ্কলন লেখা প্রায় শেষ কোরেছেন। তাঁর লেখা মধুময় হোক এই কামনা করি।

কয়েকমাস আগে নৈহাটি ষ্টেশনে একবার গোলকানন্দবাবুর সঙ্গে দেখা হোয়েছিল। এবারও তিনি বোললেন : রথের মেলায় যাবেন তো?

হেসেই জবাব দিয়েছি : তা কি বোলতে পারি! এক মিনিট পর কি হবে তা যখন বোলতে পারি না তখন এতদিনের কথা কি কোরে বলি।

ভাগ্যবান যাদুগোপাল ঘোষ।

কোন পুণ্যফলে জগন্নাথদেব তাকে রাখালের বেশে দেখা দিয়েছিলেন তা কে জানে—

লেগে যে থাকে তার যে লাভ ছাড়া লোকসান হয় না যাদুগোপাল ঘোষ তার প্রমাণ।

তুলসীদাসও বোলেছেন—

“সাচ্ কহো, লাগ্ রহো, ছোড় পরধন কি আশ্।
ইস্‌মে হরি না মিলে তো জামিন তুলসীদাস ॥”

মাহেশের রথের মেলা

"আমরা পয়সা কোথায় পাবো
আমরা উল্টোরথে যাবো"

এ ছড়া আমরা বহুকাল থেকেই শুনে আসছি। রথ সোজাই হোক আর উল্টোই হোক, কিছু পয়সা লাগবেই—সেই কিছু পয়সা যোগাড় করে মাহেশের রথ দেখে আসা যায় আর সাথে সাথে পুণ্যের থলিও কিছুটা পূর্ণ করে আনা যায়।

রথ তো অনেক জায়গায় গেলেই দেখা যায়। যেমন ধরুন শিয়ালদহের রথ, মহিষাদলের রথ, নৈহাটির কাঁঠালপাড়ার রথ। যাতায়াতের বিধিনিষেধ না থাকলে হয়তো মানুষ চলে যেতো বাংলাদেশে ধামরাইয়ের রথে, যশোহরের ভাটপাড়া ভুশিলহাটের রথে বা খুলনা জেলার যাত্রাপুরের রথে সে তো আর সম্ভব হ'চ্ছে না।

তাই এবার চলুন মাহেশের রথ দেখতে।

হুগলী জেলার শ্রীরামপুরের অন্তর্গত মাহেশ। পশ্চিমবাংলায় এতবড় রথের মেলা আর কোথাও হয় না। সবাই তো আর রথের সময় পুরী যেতে পারে না, সে খরচ জোটানোর সাধ্যও সব মানুষের নেই। সেখানেও জগন্নাথদেব মাহেশেও জগন্নাথ দেব। সবই এক। শুধু জায়গার রকমফের।

মাহেশের রথে চার থেকে পাঁচ লক্ষ লোকের সমাগম হয়। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে মানুষ আসে। মেলা তো আর একদিনের নয়, এ মেলা বেশ কিছুদিন স্থায়ী হয়। মানুষ প্রায় সারা মাস ধরেই আসে যায়। মাহেশের মাটি মানুষের পদধ্বনিতে সব সময়েই যেন জাগ্রত থাকে।

মেলায় না আছে এমন জিনিষ নেই। সার্কাস, যাত্রা, ম্যাজিক তো আছেই এ সব ছাড়া সবচেয়ে বড় আকর্ষণ গাছপালা বিক্রী আর টিয়া পাখী থেকে শুরু করে সব রকম পাখীর আমদানী হয়।

আশেপাশের শহর থেকেও অনেক নার্শারী এসে বাগান সাজায়। পাখী বেচাকেনা এমন আর কোথাও হয় না যেমন হয় মাহেশে। সংগে সংগে পাখীর খাঁচারও দোকান বসে। শিয়ালদহের বহুবাজারের দুপাশ দিয়েও পাখীর বিক্রি

হয় কিন্তু এত রঙবেরঙের বিচিত্র পাখীর সমারোহ হয় না। যেখানে পাখী বিক্রী হয়, সেখানে গিয়ে মনে হয় এটা বুঝি পাখীর মেলা। বনের পাখীই একসঙ্গে উড়ে এসে যেন বসে মাহেশে।

মাহেশ তো খুব বেশী দূরে নয় একেবারে ঘরের কাছে বললেই হয়। হাওড়া থেকে ট্রেনে শ্রীরামপুর ষ্টেশনে নেমে বাসে যাওয়া যায়। গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্তী মাহেশ এপারে খড়দহ। ব্যারাকপুর গঙ্গার ঘাট পার হয়ে যাওয়া যায়। খড়দহের কাছে নিত্যানন্দ অঙ্গনের সামনে লক্ষীঘাট থেকে খেয়াপার হয়ে অপর পারে জগন্নাথ ঘাটে পৌঁছাতে পারলেই মাহেশের রথের মেলায় পৌঁছে গেলেন।

প্রবাদ আছে যে পুরীর জগন্নাথদেবের রথটানা হবার সঙ্গে সঙ্গেই কোথা থেকে একটা টিয়াপাখী এসে মাহেশের রথের মাথায় বসে আর তখনই রথটানা শুরু হয়।

পুরীর রথ যে টানা শুরু হয়েছে ঐ টিয়াপাখী তার প্রমাণ। পুরাণে আছে যে রথের ওপর উপবিষ্ট জগন্নাথদেবকে দর্শন করলে তার সমস্ত পাপ দূর হয়ে যায়। মাহেশের রথের কলেবর পুরীর রথের চেয়েও অনেক বড়। পুরীতে যেমন তিনখানা রথ টানা হয় এখানে তেমন হয় না। কেবলমাত্র একখানা রথই মাহেশে টানা হয়। এই একখানা রথেই জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা আসন গ্রহণ করেন। মাহেশের রথের গঠন বৈশিষ্ট্যও পুরীব রথের চেয়েও বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রথটি সম্পূর্ণ লৌহনির্মিত অন্ততঃ তিন থেকে চারশো লোক টানে। লোক কম হলে রথ এক হাতও নড়বে না।

বর্তমানে এই রথ টানার সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। দুর্ঘটনা আজকাল ঘটে না বললেই চলে। কিন্তু ইতিপূর্বে এই রথেব চাকায় পিষ্ট হয়ে বহুলোক ইহলীলা সংবরণ কবেছে।

মাহেশের রথে যে লোক সমাগম হয় তা নিয়ন্ত্রণ করা স্থানীয় লোক বা সরকারী কর্মচারী দিয়ে সম্ভব হয় না। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন সংস্থা, স্কুল কলেজ থেকে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী, স্কাউটরা আসে। তারা সর্বতোভাবে দর্শনার্থীদের সাহায্য করে।

বর্তমানে যে পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে আমাদের দিন চলেছে তাতে ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মনুষ্য জনম পেয়ে এসব চোখে দেখা যায় না—তাই রথে উপবিষ্ট জগন্নাথদেবকে দর্শন করে আসা উচিৎ তা হ'লে হয়তো আর পুনর্জন্ম হবে না।

—গঙ্গার এপারে খড়দহের কাছে নিত্যানন্দ ঘাটের আশেপাশে একখানা পাথর পাওয়া গিয়েছিল, সেই পাথর থেকে তিনটি মূর্তি তৈরী হয়। তার একটা বল্লভপুরের রাধাবল্লভ মূর্ত্তি। বল্লভপুর মাহেশের পাশেই।. দ্বিতীয়টি খড়দহের শ্যামসুন্দর আর তৃতীয়টি বরহড়ার সাঁইবনার নন্দদুলাল। মাহেশের রথ দেখতে গিয়ে এই তিনটি মূর্ত্তি দর্শন করে আসা যায়।

শ্রীরামপুরে গঙ্গার ধারে কয়েকটি বিগ্রহ দেখা যায়। রাসের সময় রাধাবল্লভ বিগ্রহটি এরই ভিতর একটি মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। এইসব মন্দিরের গঠন প্রণালী দেখলে মনে হয় ওলন্দাজ আমলে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্যই এই সব তৈরী হয়েছিল, পরবর্তীকালে এইগুলোই হিন্দু মন্দিরে রূপান্তরিত হয়েছে।

শ্রীরামপুরের মিশন মাহেশের পাশে একটা দর্শনীয় স্থান। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে উইলিয়ম কেরী খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য এখানে আসেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে টমাস, ওয়ার্ড, মার্শম্যানের সঙ্গে মিলে শ্রীরামপুরের মিশন স্থাপন করেন। এখানে বসে তিনি বাইবেলের সম্পূর্ণ অনুবাদ করেন। শ্রীরামপুরের ছাপাখানা থেকে বইটি মুদ্রিত হয়। এই ছাপাখানা থেকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত প্রথম মুদ্রিত হয়। বাংলার সংবাদপত্রও প্রথম এই ছাপাখানা থেকে ছাপা হয়।

মাহেশের পশ্চিম প্রান্তে বিখ্যাত রঘু ডাকাতের কেল্লার ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায়। কথিত আছে যে, এই কেল্লার পরিখার সঙ্গে মাহেশ শহরের মাটির তলা দিয়ে গঙ্গার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল।

দেবী কল্যাণেশ্বরীর মেলা

মায়ের স্থান।

যেখানে মায়ের বসতি, সেখানেই তো মা আছেন।

এই মায়ের স্থান কথাটা নানান মুখে নানান ভাষায় ঘুরতে ঘুরতে ছোট হয়ে গেল মাইথন।

এই মা হলেন কল্যাণেশ্বরী।

একদিকে বাংলার শেষ সীমানা আর একদিকে বিহারের শুরু। এমন জায়গায় এই কল্যাণেশ্বরী মন্দির।

সে আজ কত বছর আগের কথা কে জানে—

হয়তো চারশো কি পাঁচশো বছর হবে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কেমন করে এখানে মা এলেন, কে মায়ের প্রতিষ্ঠা করেছে, তা আজ কিংবদন্তীতে দাঁড়িয়েছে।

কথিত আছে যে আগে এখানে কোন লোকবসতি ছিল না। চারিদিকে শাল মহুয়ার বন আর পাহাড়। দিনের বেলায় মনে হ'ত রাত নেমেছে। এত জঙ্গলে ভরা ছিল। পাহাড়ের ওপর বনঝোপ আর পাহাড়ী ফুলের গাছ—মাঝে মাঝে বড় গাছও ছিল ঐ পাহাড়ে।

লোকে বলে এখানে নাকি ডাকাতদের আড্ডা ছিল। তারা এখানে দেবী কল্যাণেশ্বরীর পূজো করত আর সুযোগ মত মানুষ খুন করে তাদের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করত। মায়ের পূজোর সময় তারা নাকি 'মা মা' হুঙ্কার ছাড়তো বিকটভাবে।

এই মন্দিরের বিশেষত্ব হচ্ছে যে মূর্তি ভাল ভাবে দেখা যায় না। মন্দিরের ভিতরটা ভয়ানক অন্ধকার। কোনো জানলা নেই। প্রদীপের আলোতে যেটুকু আলো হয়, সেই আলোতেই মন্দিরের পুরোহিত ফুল বেলপাতা দিয়ে পুজো করেন। মায়ের মূর্তিটি পাহাড়ের গুহার মধ্যে পাথরের সঙ্গে যুক্ত এবং মা পিছন ফিরে আছেন। মূর্তিটি এত ছোট যে, তা পাণ্ডা বা পুরোহিত না দেখালে দেখা যায় না।

একপাশে সিদ্ধকুণ্ড। শোনা যায় দেবী কল্যাণেশ্বরী মেয়ে সেজে ঐ কুণ্ড

থেকে স্নান করে ঐ মন্দিরের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে যান। এই কুণ্ডের জল মাথায় দিলে সর্বপাপ ক্ষয় হয় এবং যে যা মানত করে, তা পূর্ণ হয়।

আজকের কল্যাণেশ্বরী নতুন রূপ ধারণ করছে। আজ তার সামনে দিয়ে পীচ ঢালা রাস্তা হয়েছে। অনবরত বাস চলছে, ট্যাক্সি চলছে কল্যাণেশ্বরীর ওপর দিয়ে। কোনটা আসছে চিত্তরঞ্জন থেকে, কোনটা আসছে আসানসোল বরাকর থেকে। কোনটা আসছে আসানসোল থেকে মাইথন হয়ে। সারা ভারতবর্ষের মানুষই এখানে আসে। মানুষ আসার কোন বিরাম নেই।

কল্যাণেশ্বরীতে মানুষের বসতি প্রচুর।

মন্দির ঘিরে রং বেরঙের দোকানপাট, বাজার, সব কিছুই আছে।

এখানে নিত্য মেলা। কোন তিথি নক্ষত্র নেই, কোন বিশেষ উৎসব নেই, —নিত্য পূজা, নিত্য মেলা। দোকানপাট নিত্য বসে। এসব নিয়ে আজ কল্যাণেশ্বরী জম-জমাট।

মন্দিরের ভিতরে ঢুকতেই সারি সারি দোকান। অনবরত মানুষ পূজো দিতে চলেছে। কেউ বা ফুল বেলপাতা আর ভোগ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাঁঠাবলি নিত্য হয়। সব মানত করা পাঁঠা। মাথা নীচু করে ঢুকতে হয় মন্দিরের ভিতরে। ধূপ-ধূনার গন্ধে ভরপুর—এর মাঝে তীর্থযাত্রীরা পূজা দিচ্ছেন। মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে কত রকম প্রার্থনা করছেন। ভক্তিময়ী, করুণাময়ী দেবী কল্যাণেশ্বরীর কাছে সবাই নিবেদন করছে তাদের ভক্তি আর শ্রদ্ধা। ভক্তিতেই তো ভগবান দরশন!

কালের বিবর্তনে আজ সে ডাকাতের দল কোথায় চলে গেছে। হয়তো তারা মায়ের চরণেই ঠাঁই পেয়েছে।

মূর্তিটি এত ছোট কেন? এ সম্বন্ধে কেউ কেউ বলেন যে, কালাপাহাড়ের হাত থেকে ঐ মূর্তি রক্ষা করার জন্য ঐ ভাবে মূর্তিটা ছোট করা হয়েছে এবং ফুল বেলপাতা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়।

কল্যাণেশ্বরী যেতে গেলে আজকাল আর কোন ভাবনা নেই। মাতৃদর্শন যদি একান্তই কাম্য হয়, তাহলে যে ভাবে হোক ঠিক পৌঁছে যাবেন ক্যলানেশ্বরীতে। আসানসোল বরাকর, চিত্তরঞ্জন কুমারধুবী হয়ে মাইথন থেকে সব সময় বাস যাতায়াত করছে।

পায়ে হেঁটে যদি যাওয়া যায়, তাহলে আরও মনোরম লাগে। কুমারধুবী রেলষ্টেশন নেমে বাসে চেপে মাইথনের বাঁধের কাছে নেমে পায়ে হেঁটে মাই-

থনের অপরূপ বনরাজির ভিতর দিয়ে একপেয়ে রাস্তা দিয়ে উঠতে হবে ওপরে মাইথন বাঁধে।

বনপথ এত মনলোভা, তা ভোলবার নয়। কত রকমের গাছ। মাঝে মাঝে ছোট ছোট পার্ক। রং-বেরঙী ফুলের গাছ। বনপথ দিয়ে উঠে যেতে হবে মাইথন বাঁধের ওপর। এপাশে ওপাশে বড় বড় পাহাড়। বাঁধের নীচে দামোদরের জলধারা। সমতলভূমি কত নীচে। বাঁধ শেষে বিরাট উঁচু পাহাড় এই পাহাড়ের ভিতরেই জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

পাহাড় থেকে নীচে নেমে যে রাস্তা, সেইরাস্তায় আট মাইল গেলেই কল্যাণেশ্বরী মন্দির।

লাল মাটির পথ। পাথরের কুচিগুলো পায়ে বেঁধে! তা বিঁধুক। কষ্ট না করলে তো মায়ের চরণ পাওয়া যাবে না!

মা দুহাত মেলে সবাইকে ডাকছেন।

যেভাবে হোক, পৌছাতে পারলেই তো লাভ!

এখান থেকে মাইল দশেক দূরে চিত্তরঞ্জন রেল কারখানা, আরও কিছু দূরে রূপনারায়ণপুরের কেব্‌ল ফ্যাক্টরী।

কল্যাণেশ্বরীতে মাকে দর্শন করে যেদিকে দু' চোখ যায় চলুন। দেখার জিনিষ চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে।

কেন্দুবিল্বে জয়দেবের মেলা

পৌষ সংক্রান্তির দিনে দুর্গাপুর নেমে যদি কোন পথচারী আপন মনে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায় কেউ না কেউ তাকে জিজ্ঞেস করবেই—কি গো কুথা যাবে, জয়দেব নাকি? যাও গো যাও, ভারী মেলা, কত বাউল গান—ঐ তো বাস দাঁড়িয়ে, চড়ে বসো। চট করে চলে যাবে।

সবাই জানে পৌষ সংক্রান্তির দিন অজয় নদীর ধারে কেন্দুবিল্বে কদমখণ্ডীর ঘাটে মকর স্নান। সারা ভারতবর্ষের কয়েক লক্ষ মানুষ প্রতি বছর আসেন জয়দেব। কদমখণ্ডীর ঘাটে স্নান করে পুণ্য অর্জ্জন করেন। সারা গ্রাম জুড়ে অজয়ের ধার দিয়ে বিরাট মেলা বসে। ভারতবর্ষের প্রতিটা প্রদেশ থেকেই আসে তীর্থযাত্রী, দোকানী, সার্কাস, যাত্রা, পুতুল খেলা, ম্যাজিক, নাগর দোলা। আর আসে সারা জেলা থেকে শত শত বাউল। সারাদিনই ঘুরে বেড়ায় এ অঞ্চলে। মেলায় ঘুরতে ঘুরতে কোন গাছতলায় বা আখড়ার কাছে এসে দাঁড়ালে শুনতে পাওয়া যায় মধুর সুরে গান—

'আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে?
আমি জনম ভরে একদিন দেখলেম না রে।
নড়ে চড়ে ঈশানকোনে
আমি দেখতে পাই না দুনয়নে,
হাতের কাছে যার, ভবের হাট-বাজার,
হাত বাড়ায়ে ধরতে পেলেম না তারে।'

যেতে যেতে আবার কোন গাছতলায় ভীড় দেখে থমকে দাঁড়াতে হবে। কাণে ভেসে আসবে—

'দেখলাম এ সংসার ভোজের বাজী প্রায়।
দেখতে দেখতে তেমনি কে বা কোথায় যায়
মিছে এ ঘর বাড়ী, মিছে টাকা কড়ি,
মিছে দৌড়াদৌড়ি করি কার মায়ায়।'

হোটেল আর খাবারের দোকান যে কত বসে, তা গুণে শেষ করা যায় না। চারদিকে শুধু মানুষ। গৃহস্থের ঘরবাড়ী, মাঠ-ঘাট গাছতলা সব কিছুই মানুষে ভরে যায়। এত বড় মেলা, ভারতবর্ষে গঙ্গাসাগরে মেলার পর এর স্থান। ট্রেনে

ভীড়, বাসে ভীড়, হাঁটাপথেও সমান ভীড়। সরকারি কর্মচারী থেকে শুরু করে বর্দ্ধমান বীরভূমের বেসরকারী সংগঠন, স্কাউট, এন. সি. সি. বিভিন্ন ক্লাব মেলার ভীড় নিয়ন্ত্রন করতে হিমসিম খেয়ে যায় কয়েকটা দিন।

জয়দেব যেতে হলে কোন কষ্ট নেই। বর্দ্ধমান নেমে বাসে ইলামবাজার হয়ে জয়দেব যাওয়া যায়। দুর্গাপুর ষ্টেশন থেকে সোজা বাসে চলে যাওয়া যায় জয়দেবের মেলায়। অনেকে আবার সাইকেলেও যান। পথেরও অভাব নেই, যানবাহনেরও অভাব নেই।

এবার বলি কেন এই মেলা হয়।

কবি জয়দেব প্রত্যেক পূজাপার্বণে গঙ্গাস্নান করতে যেতেন। অনেকটা পথ তাঁকে পায়ে হেঁটে যেতে হত। আবার পায় হেঁটেই তাকে কেন্দুবিল্বে ফিরে আসতে হত। পায় হেঁটে যাওয়া আসা এতদুর পথ কি যে কষ্ট, তা সহজেই অনুমান করা যায়। যখনকার কথা বলছি তখন এত যানবাহনের প্রাচুর্য্য ছিল না। সে আজ আটশো বছরের কথা হবে।

তখনকার দিনে মানুষ দশ পনরো ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে যাতায়াত করত।

একবার জয়দেব পৌষ সংক্রান্তির সময় ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েন। এত অসুস্থ হয়ে পড়েন যে, চলবার শক্তিও একেবারে রহিত হয়ে যায়। তিনি যে প্রতিবারই পৌষ সংক্রান্তির দিন গঙ্গাস্নান করেন, এবার তাহলে তাঁর ভাগ্যে গঙ্গাস্নান নেই।

দুচোখে নেমে আসে তাঁর জলের ধরা। তিনি বালকের মত কাঁদতে থাকেন আর বলেন: হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু, এ তুমি কি করলে! আমাকে একটু চলবার শক্তি দাও।

সাধক কবি জয়দেব মা গঙ্গার উদ্দেশ্যে কাতর ভাবে প্রার্থনা জানান ও তাঁর আরাধনা করেন।

পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন জয়দেব তাঁর বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে থাকেন। কিন্তু ভক্তের আবেদন কি ব্যর্থ হয়? ভক্তিভাবে যে তাঁকে ডাকে, তিনি তাঁর মনোবাসনা অবশ্যই পূরণ করেন।

পৌষ সংক্রান্তির দিনে ভোরবেলায় সারা কেন্দুবিল্বের মানুষ অবাক বিস্ময়ে দেখল যে অজয়ের দুই কূল ছেপে এসেছে বন্যা। অজয়ের সাদা জলে মিশে গিয়েছে গেরুয়া রঙের জল। পূর্ববাহিনী স্রোত আজ পশ্চিমমুখী হয়েছে। গাছের পাতা গাছ থেকে উড়ে এসে অজয়ের বুকে আছড়ে পড়ে গঙ্গাস্নান করছে।

উড়ে যাওয়া পাখী এসে জলের ধারে বসে মাথা ডোবাচ্ছে।

জয়দেব আনন্দে উন্মাদ হলেন।

কদমখণ্ডীর ঘাটে গঙ্গার স্রোতধারা! একি কাণ্ড!—জয়দেব 'মা' 'মা' বলে ঝাঁপিয়ে পড়েন পতিতপাবনী গঙ্গার বুকে। জলের ভিতর আনন্দে গড়াগড়ি যান। কোথায় তাঁর সে অসুস্থতা! দেহে যেন প্রচণ্ড শক্তি এসে ভর করছে এক নিমিষে।

সেই থেকে এই কদমখণ্ডীর ঘাটে প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তির দিনে অজয় নদীতে গঙ্গাস্নান করে হাজার হাজার মানুষ, আর সেই উপলক্ষে কেন্দুবিল্বে বসে বিরাট মেলা।

জয়দেবের একনিষ্ঠ ভক্তি ও একাগ্রতায় সুরধনী নেমে এলেন অজয়ের সাদা জলে। ভক্তের মনো-বাসনা পূর্ণ করার জন্য তিনি যেন সব সময় তৈরী হয়ে আছেন।

শুধু ডাকতে হবে অন্তর উজাড় করে।

ডাকলে তিনি শোনেন—

না ডাকলে তিনিই ডাকেন।

কান পেতে থাকতে হবে একমনে।

তবেই শোনা যায় তাঁর ডাক।

জয়দেব থাকতেন কেন্দুবিল্ব গ্রামে—

তাঁর সব কিছু থাকলেও তিনি ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির। তিনি কারো সঙ্গে মিশতেন না। আপন মনে তিনি ঘুরে বেড়াতেন।

অজয়ের ধার তাঁর কাছে ছিল সবচেয়ে প্রিয়।

তিনি গাছে গাছে কাঠি দিয়ে কৃষ্ণনাম লিখতেন।

গাছের পাতা ছিঁড়ে তাতে কৃষ্ণনাম লিখে সেই পাতা অজয়ের জলে ভাসাতেন।

কৃষ্ণময় জগৎ তাঁর। সব কিছুতেই তিনি কৃষ্ণ দরশন করেন।

পশুপাখী তরুলতা সবার ভিতরেই তিনি কৃষ্ণকে দেখেন।

কখনও বালকের মত কাঁদেন।

চোখের জলেও কৃষ্ণ।

"যাহা যাহা নেত্র পড়ে
তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে।"

জয়দেবকে কেউ বলে পাগল, কেউবা বলে চরিত্রহীন।

এসব কথায় তিনি কান দেন না।

তিনি কাঁদছেন—কৃষ্ণ হে আর কবে দেখা দেবে। তোমার প্রেমে কবে ডুবে যাবো। দিন যে চলে যায়।

জয়দেব রাতে গাছতলাতেই নিদ্রা যান

সারা বিশ্বকে যিনি ঘর করেছেন, তারমত বড় আশ্রয় কার আছে এ দুনিয়ায় ?

ক্লান্তিতে জয়দেব নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। কি নির্বিকার মানুষ! অন্ধকার রাত, গাছতলায় শয্যা, কোন ভয়ই তাঁর নেই।

গভীর রাতে জয়দেব স্বপ্ন দেখেন। কে যেন তাঁকে বলছেন—জয়দেব, তোমার ভক্তিতেই আমাকে আসতে হল। অজয়ের ধারে জলের নীচে আমি তোমার অপেক্ষায় আছি, আমাকে নিয়ে যাও।

ভোরের আলো না ফুটতেই জয়দেব ছুটে যান কদমখণ্ডীর ঘাটে। জলের ভিতর আছড়ে পড়েন—শুধু ডুব দিচ্ছেন আর উঠছেন। শেষে অনেক ডুবের পর তুললেন রাধাশ্যামের এক যুগল মূর্তি।

পাড়ে উঠে তিনি মূর্তি মাথায় নিয়ে নাচতে থাকেন আর বলেন: এ তুমি কি করলে ঠাকুর! তোমাকে আমি এখন কোথায় রাখি, কি দিয়ে তোমার সেবা যত্ন করি? আমার যে কিছুই নেই!

রাধাশ্যাম বিগ্রহের কথা তড়িত গতিতে প্রচার হয়ে যায় চারিদিকে। হাজার হাজার মানুষ এসে ভীড় করল কদমখণ্ডীর ঘাটে। শুনলেন বর্দ্ধমানের মহারাজাও তিনি দলবল নিয়ে ছুটে এলেন কেন্দুবিল্বে। কয়েকদিনের মধ্যে কদমখণ্ডীর ঘাটে গড়ে উটলো রাধাশ্যমের এক বিরাট মন্দির। ধীরে ধীরে তৈরী হল ভজনালয়, অতিথিশালা, আরও কত কি।

সারা দেশের মানুষ জানলো কদমখণ্ডীর কথা।

জয়দেবের স্ত্রী ছিলেন ভক্তিমতী পদ্মাবতী। 'গীতগোবিন্দ' রচনা করে জয়দেব সারা পৃথিবীতে অমর হয়ে আছেন।

আশেপাশে:

জয়দেবের মেলা থেকে কয়েক মাইল দূরে নান্নুর গ্রাম। এখানে জন্মেছিলেন ভারতবর্ষের আর এক মহাকবি চণ্ডীদাস। নান্নুর গ্রামে বাশুলীদেবী নিত্য পূজিতা হন।

কেন্দুবিল্বের দুই মাইল দূরে বিল্বমঙ্গলের জন্মস্থান। বিল্বমঙ্গল আর চিন্তামণির কথা আজও দেশের মানুষ শ্রদ্ধাভরে শুনছে যাত্রার পালায়।

বাঁকুড়া গৌরবেড়ার শ্মশানকালীর মেলা

'এপারে গোকুল ওপারে মথুরা
মাঝে যমুনার জল।
ভর ভর করে তোর ব্যাথা বুঝি
বয়ে যায় অবিরল॥'

মথুরা ও গোকুল কোনটার কথাই বলছি না। বলছি দামোদরের কথা। এপারে বর্দ্ধমান ওপারে বাঁকুড়া মাঝে দামোদর। সেই দামোদরের জলে কত শত ব্যথার ঢেউ বয়ে চলেছে তার কথা মানুষ কোন দিন ভুলতে পারবে না। দুর্গাপুর ষ্টেশন ছাড়িয়ে দামোদরের ওপর বিরাট লম্বা দুর্গাপুর ব্যারেজ। ব্যারেজ পার হলেই বাঁকুড়ার শুরু হোল।

মাঝে দামোদর।

এই দামোদর আগে কত মানুষকে পথে বসিয়েছে, কত শত শত বিঘা ফসল নষ্ট করেছে। সে ভয়ঙ্কর দিনের কথা মানুষের মন থেকে মুছে যায় নি।

আজ দামোদর বাঁধা পড়েছে।

বর্দ্ধমানের ক্ষেতে আজ ফসলের সমারোহ।

দামোদর নিজে বাঁধা পড়ে মানুষের ঘরে লক্ষীকে বেঁধে রাখার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

যদি কোনদিন জয়দেব বা চণ্ডীদাসের বাশুলী দেবীর মন্দির দেখার জন্ম ঘর থেকে বের হন আর ভীড়ে যদি বাসে না উঠতে পারেন, যদি জয়দেবে যাওয়া না হয়, তাহলে ঘরে ফিরে যাবেন না। যে মন নিয়ে জয়দেব চলেছিলেন, সেই মন নিয়েই দুর্গাপুর ব্যারেজ পার হয়ে চলে যান ওপারে। ওপারের মাটি তখন বাঁকুড়া জেলার।

ব্যারেজ থেকে নেমে আঁকা-বাঁকা পথ দিয়ে চলে যান গৌরবেড়া গ্রামে। নানান্ রঙের বনফুল বাতাসে দোল খাচ্ছে অবিরাম, ঝিরঝিরে হাওয়ায় মাঝে মাঝে শীত লাগে।

দিনটা পৌষ মাসের সংক্রান্তি।

একপাশে দামোদর—

কোথায় হাঁটু জল, কোথায় বা বুক জল, কোথাও আবার জল নেই শুধু বালি। ঐ জলে হাজার হাজার মানুষ স্নান করছে মকর সংক্রান্তির স্নান।

যাঁরা এই পুণ্যতীর্থে আসেন, অবগাহন করেন তাঁরা দামোদরকে পতিতপাবনী গঙ্গাই মনে করেন। শত শত মানুষ বোতলে করে দামোদরের জল নিয়ে যায়।

জিজ্ঞাসা করেছি কয়েকজনকে—কেন এভাবে মানুষ জল নিয়ে যায়।

কেউ বলেছেন—বলেন কি! এইতো গঙ্গা।

কেউ জবাব দিয়েছেন—এ জল কত পবিত্র তা জানেন, সেই জন্মই তো নিয়ে চলেছি। মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে বা কেন্দুলী জয়দেবে অজয় নদীতে স্নানে যে পুণ্য, সেই পুণ্য, দামোদর স্নানেও।

এই মানুষের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের বলেই হাজার হাজার মানুষ দামোদর স্নান করে ঐদিন গৌরবেড়া গ্রামে শ্মশান কালীর পূজো দিতে যায়।

গৌরবেড়া। কোন্ গৌর যে সত্যিসত্যিই বেড়া দিয়েছিলেন তা জানি না।

তবে ব্যারেজ থেকে দেখলে মনে হবে গ্রামটা চারিদিক থেকে নানান রকম গাছ-গাছালী দিয়ে ঘেরা।

প্রতাপপুর রোড চলে গেছে বাঁকুড়া পর্য্যন্ত।

এই পথের দুধারে মানুষের সারি। ওপারে বাস এপারে বাস।

গৌরবেড়াতে একটা মনসা মন্দির ও শ্মশানকালীর মন্দির আছে। দেখলাম একটা গাছের নীচে মাটির ঢিবির ওপর একটা মূর্ত্তি। তাতে সিন্দুর মাখানো। মূর্ত্তির সামনে অজস্র মাটির ঘোড়া। ওপাশে শ্মশান কালীর মন্দিরে একজন সাধু দেখলাম ধূনি জ্বালিয়ে বসে আছেন। কবে থেকে যে এ মেলা বসছে, কেন এই মেলা, অনেককেই জিজ্ঞাসা করলাম। জবাব পেলাম—মশায়, জন্মে অবধি দেখছি এই মেলা। একজন প্রাচীন গ্রামবাসীকে জিজ্ঞেস করায় জবাব পেলাম—একশো বছর তো হবেই। তিরিজী কালীবাড়ী তখন কোথায়? সব কথা কি বাবু মনে আছে। তবে এখানে শ্মশান ছিল, এই কালীও তাই শ্মশানকালী। দেব দেবতা তো বাবু চিরদিনই জাগ্রত—এখনকার মানুষ তো কিছুই বিশ্বাস করে না, তাই দেব-দেবতাকে ঘুমপাড়িয়ে রেখেছে। দেবতা জাগ্রতই। তাঁকে জাগাতে হলে যে ভক্তির দরকার, সে ভক্তি এখন মানুষের নেই।

যাই থাক আর না থাক—স্থান মাহাত্ম্য একটা আছে বৈকি! নইলে এত মানুষ কেন আসে? কিছু একটা আছে। কিন্তু সেই কিছুটা কি?

তবে কি কোন ইতিহাস আছে? সরকারের ঘরে কি কোন তথ্য আছে?

নেই। কিছু নেই—কে রাখে কার তথ্য। সারা পৃথিবীতে আমাদের মত সাংস্কৃতিক তথ্য, পুরাণো স্মৃতি আর জীবন্ত সৃষ্টিকে এত অবহেলা আর কেউ করে না। কিছুদূরে ওপারে দামোদরের টুরিষ্ট লজ।

কেউ কি কোনদিন বৈদেশিক অতিথিকে বলেছেন—চলে যাও ওপারে গৌরবেড়া গ্রামে, প্রাচীন সংস্কৃতি কিছু দেখে এসো। আমার মনে হয় কেউ তা বলেন নি।

এ মেলার বৈশিষ্ট্য তেলে ভাজার গন্ধ। বস্তা বস্তা মুড়ি আর গরম তেলেভাজা বেগুনি, চপ। কিছু মনোহারী, কাঠের বারকোশ, বেলুন চাকীরও দোকান আছে। শাঁকালুর প্রাচুর্য্যই বেশী। বস্তাতে, ধামাতে নিয়ে সব বিক্রেতা বসে গেছে। গৌরবেড়া গ্রামে বাউরীদের বাসই বেশী। অন্য সম্প্রদায়ের লোকও কিছু আছে। একদিনের গৌরবেড়ার মেলা। কিন্তু জড়ো হয় হাজার হাজার মানুষ। একটু আগে বলেছি একটা কিছু আছে। সেটা ভক্তি আর বিশ্বাস। নাই বা থাকলো ইতিহাস। নাই বা থাকলো পুঁথিপত্র। ভক্তি যদি থাকে, মানুষ চিরদিনই আসবে গৌরবেড়া গ্রামে।